রাজ মোহনের বৌ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
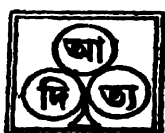
রাজমোহনের বৌ

॥ এক ॥

রাধাগঞ্জ গ্রামটি মধুমতী নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের মেঠো পথ ধরে কলসী কাঁখে যুবতীটি এগিয়ে চলেছে। পথে পড়ল এক প্রতিবেশীর গৃহ। পরিচ্ছন্নতার মাধুর্যে ভরা সেই গৃহ। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই কোথাও। বাঁশের বেড়া ঠেলে ঐ গৃহে প্রবেশ করল সেই তরুণী।

দাওয়ায় বসেছিল এক আঠারো বছরের তরুণী। চারধারে সেলাই-এর সরঞ্জাম নিয়ে। পাশেই একটি শিশু। এক দোয়াত কালি উল্টে ফেলে দিয়ে কোন একটা গুণপনার স্বাক্ষর আঁকতে ব্যস্ত।

কাঁখের কলসী মাটিতে রেখে শুভ সম্ভাষণ করে কাছে এসে দাঁড়াল সেই রমণী।

হাতের সেলাই-এর ওপর সূঁচের একটা ফোঁড় দিতে দিতেই সহাস্য অভ্যর্থনা করল ঐ যুবতী—এসো, এসো কনকদি। আমার কি ভাগ্যি যে তুমি এসেছ!

—ভাগ্য হবে কেন ভাই! কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলে তা দেখতে হবে তো!

—কার মুখ দেখে আবার উঠলাম?

—কার আবার? যার মুখ দেখে রোজ রোজ ঘুম ভাঙ্গে, তার। কৌতুকের হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল কনকের মুখে। কিন্তু এই কৌতুকে যোগ দিতে পারল না তরুণীটি। তার মুখ থেকে খুশীর আলো নিবে গেল যেন। কনক বুঝতে পারল, পরিহাস করতে গিয়ে প্রতি পক্ষের অন্তরে আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে। কনক তাই লজ্জিত হয়ে চুপ করে থাকল। অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনল সে।

—কই, বেলা যে পড়ে এল! জল আনতে যাবিনে? তরুণীটিকে

তাগিদা দিল কনক। কিন্তু জল আনবার প্রস্তাবে মোটেই উৎসাহিত হলো না ঐ তরুণী। সে যেন ভয়ে ভীত হয়ে উঠল। বলল।

—ও বাবা! নদীতে কুমীর আছে। গেলে কামড়ে দেবে।

—না লো না! সে ভয় নেই। কুমীরগুলো অত হ্যাংলা নয়। পরস্ত্রীর ওপর অত লোভ করে না ওরা! বাঁকা চোখে তরুণীটির দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল কনক। তারপর বলল,—না। মিছে কথা নয়! বেলা বয়ে যাচ্ছে। জল আনতে যাবি তো চল।

তরুণীটি ঈষৎ বিষণ্ণ মুখে বলল—তুই তো জানিস কনকদি, আমি জল আনতে যাই না কোন দিন।

—কেন?

—আমার স্বামী ওসব পছন্দ করেন না।

—হুঃ! ঠোঁট বাঁকাল কনক। তবে তোদের জল কে এনে দেয় শুনি? তোদের ঝি-চাকর আছে ক' গণ্ডা বলতো!

নাই থাকুক! কিন্তু আমার স্বামী আমায় বারণ করেছেন, তাঁর কথা তো ঠেলতে পারিনে!

—ওঃ! খুব যে পতিভক্তি। আহা। কী সতীসাধ্বী মেয়ে—একটা স্বামী তোর, তার কথাতেই উঠিস্ বসিস্ তুই! আমার যদি বিশটা থাকতো, তবু তো তাদের কথা শুনতাম না লো।

—ওমা! বলো কি? তোমার বুঝি একটাতে সুখ হয় না—আরো ডজন দুয়েক হলে মোটামুটি পুষিয়ে নিতে পারো।

—তা নয়তো কি! পথে ঘাটে হা-হিল্লে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কত নাগর। তাদের যদি রূপের ছটায় না মজাতে পারি, তবে আর কামিনী হয়ে জন্ম নিলুম কেন? চল,—

তরুণীটি এবার উঠে দাঁড়াল।

কনকের অনুরোধ সে এড়াতে পারল না। ছোট্ট একটা কলসী কাঁখে তুলে নিল সে! দ্বিধাগ্রস্থ পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে এল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। বলল—ওঁর অমতে যাচ্ছি, পাপ হবে না তো!

—হ্যাঁ! খুব পাপ হবে? চোখ দুটো বড় বড় করে উপহাসের সুরে বলল কনক—তিন রাত্রি নরক বাস করতে হবে। জানিস না?

বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল কনক। তারপর জোর করে ওকে টেনে নিয়ে চলল মধুমতীর তীরে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে জল নিয়ে ফিরে এল সেই তরুণী আর কনক। তরুণীটি মনে মনে অনুতপ্ত। স্বামীর কথাই ভাবছিল···।

স্বামী জানতে পারলে নিশ্চয়ই তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। কেন এমন করে ওঁর অগোচরে জল আনতে গেল সে! অন্যায় হয়েছে এটা!

ভাবতে ভাবতে এমনি এগিয়ে চলছিল ওরা। পথে পড়ল মনোরম একটি উদ্যান।

উদ্যানে বিচিত্র পুষ্পের সমারোহ। ঠিক মাঝখানে একটি স্বচ্ছ পুষ্করিণী—পাশেই অট্টালিকা! তার বৈঠকখানায় দু'জন যুবক পরস্পরের সাথে আলাপরত। একজনের বয়স ত্রিশের উর্দ্ধে। রং কালো—সুগঠিত দেহ। পরনে ধুতি কামিজ ও মাথায় পাগড়ি বাঁধা। গলায় হেলে হার। অন্যজনের বয়স বাইশ-তেইশ। সুদর্শন।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি অপর জনকে সম্বোধন করে বলল,—দেখ মাধব—তোমার ঐ কলকাতাপনাকে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারিনে দু'চোখে।

—কলকাতাপনা আবার কি জিনিস মথুরদা!

—মানে তোমার ঐ কলকাতার ওপর টানটাকে—

মাধব বলল—কেন, কলকাতাকে আমি ভালবাসি, সেটা আবার অন্যায় কি হল! কলকাতায় আমি বাস করেছি বহুদিন, তাছাড়া আমার কাজও রয়েছে ওখানে, টান হবে না?

—থামো হে—থামো। কলকাতায় তোমার কি কাজ, সে আমার জানা আছে। রেস, মদ আর বারাঙ্গনা এই তো কাজ?

মাধব কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল, কিন্তু ওর দৃষ্টিটা হঠাৎ পথের দিকে আকৃষ্ট হল।

ঐ পথ দিয়েই কনক তার সঙ্গিনীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। মাধব সেই দিকেই হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে মথুর বলল,—ঐ ছুঁড়িটাকে অমন করে দেখছো কিহে! কনককে কি তুমি চেন না?

কিন্তু শুধু কনক নয়।

কনকের সাথে আর একটি অল্পবয়স্কা তরুণী রয়েছে। ঘোমটা দেওয়া রয়েছে বলে মুখটা ঠিক দেখতে পারছে না সে। কিন্তু ঐ কাপড়ঢাকা দেহের যেটুকু কান্তি বেরিয়ে আসছে, সেইটুকুর দিকেই মথুর আর মাধব লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল।

ঠিক এমনি সময় বাতাসের উন্মত্ততায় ক্ষণিকের জন্য হলেও মুখের অবগুণ্ঠন গেল খুলে। কিন্তু তড়িৎ গতিতে আবার ঘোমটা টেনে দিল সেই তরুণী। মুগ্ধ হয়ে গেল মথুর। বলল—ঐ যে মেয়েটি। ও কে বলতো।

গম্ভীর হয়ে গেল মাধব। উত্তর করল—আমার শ্যালী।

—তোমার শ্যালী? তার মানে, রাজমোহনের বৌ?

হ্যাঁ। উত্তর করল মাধব।

মথুর তখনও তাকিয়েছিল সেই তরুণীটির দিকে। তন্ময় হয়ে বললে—বাঃ বাঃ! খুব সুন্দর বৌ তো। ওর বরাত ভাল।

মাধব কোন কথা না বলে চুপ করে থাকল।

মথুর আবার বলল, কিন্তু রাজমোহনের ঘরে এমন বৌ মানায় না, তা তুমি যা-ই বল মাধব।

—কেন?

—তা নয় তো কি? কী দানব প্রকৃতির ঐ রাজমোহন, তার ঘরে এমন দেবীপ্রতিমাসম বৌ! সহানুভূতিতে কণ্ঠস্বর গাঢ় করে তোলে মথুর। বলে— বৌটাকে নিশ্চয়ই খুব নির্যাতন করে ও!

—তা হয় তো মিথ্যে নয়। মাধব উত্তর দিল।

—করলেও এখন আর করবে না, জেনে রাখো। মেয়ে মানুষের মন। বুঝলে কিনা, স্বামীসঙ্গ থেকে সুখ না পেলেই মন যায় বিগড়ে আর তখনই পরপুরুষের আসক্তি যায় বেড়ে। বুঝলে ভায়া!

—তুমি কি বলছো মথুরদা!

—যাও! পরস্ত্রীর সম্বন্ধে এসব চর্চা তোমার ভাল না মথুরদা।

মাধব রুষ্ট হয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল।

॥ দুই ॥

দ্রুত পদে বেরিয়ে এলো মাতঙ্গিনী। ঘৃণা ও লজ্জায় তাঁর যেন মাথা কাটা গেল। বলল—ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা কনকদি। ওরা বুঝি আমায় দেখে ফেলেছেন।

—দেখে ফেলেছেন তো কী হয়েছে। তুই কি তোর ভগ্নিপতি মাধববাবুকে দেখিস নি কোনদিন?

—তা দেখবো না কেন? কিন্তু তিনি তো একা নন, তাঁর সাথে যে আর একজন রয়েছেন।

কনক বলল—ও বুঝেছি, তুই মথুরবাবুর কথা বলছিস? উনিতো তোর ভগ্নীপতির জ্যেঠতুতো ভাই।

—কী লজ্জা! তুমি আবার কাউকে যেন বলো না একথা।

—পাগল! বলল কনক,—এসব কথা কাউকে বলতে আছে?

মাতঙ্গিনী এমনি কথা কইতে কইতে গৃহ প্রাঙ্গনে এসেই চমকে উঠল। দেখতে পেল, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং রাজমোহন, ক্রুদ্ধ আর রুষ্ট দৃষ্টি নিয়ে।

মাতঙ্গিনীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রাজমোহন। মাতঙ্গিনীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আতঙ্কে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে কনকেরও।

ফিস্ ফিস্ করে বলে কনক—সর্বনাশ ! কী হবে এখন। একেবারে খোদ কর্তার চোখে পড়ে গেলি যে হতভাগী ! চল, আমিও তোর সাথে থাকি নইলে এখুনি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে যাবে যে !

—তা যাক্ ! তুমি যাও কনকদি। তুমি থাকলে আরও কেলেঙ্কারী হবে। আর তা ছাড়া,—একটু থেমে বলল।

—কনকদি, ও সব আমার সয়ে গেছে, সামলে নিতে পারবো।

কনক চলে গেল।

কম্পিত পদে, দুরু দুরু বক্ষে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল মাতঙ্গিনী। রাজমোহন এক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল। চোখ থেকে তার যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরছিলো। মাতঙ্গিনী কলসী কাঁখে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতেই সে হিংস্র গর্জনে বলে উঠল—এদিকে আয়।

মাতঙ্গিনী কলসীটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে বলল,—কী বলছো ?

—কোথায় গিয়েছিলি ?

জল আনতে ? শান্ত ও নরমস্বরে উত্তর দিল মাতঙ্গিনী।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রাজমোহন। ভরা কলসীটা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—কেন গিয়েছিলি মুখপুড়ি ! বাইরে যেতে তোকে আমি নিষেধ করেছি না ?

—তা করেছো ! উত্তর দিল মাতঙ্গিনী,—কিন্তু জল আনতে বাইরে যাওয়া তো দোষের নয়।

—তবে রে হতচ্ছাড়ী, কোনটা দোষের আর কোন্টা দোষের নয়, সেটা তোব কাছ থেকে আমায় শিখে নিতে হবে। ক্ষিপ্ত রাজমোহন বৌয়ের একটি হাত বজ্রমুটিতে চেপে ধরে প্রহার করতে উদ্যত হলো।

পাথর প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইল মাতঙ্গিনী। ভীতও হল না, আর চেষ্টাও করলো না অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে। নিষ্পলক চোখ দুটি থেকে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু মারবার জন্য হাত তুললেও মারতে পারল না, চোখের জল

দেখে, ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে দিল রাজমোহন। স্ত্রীকে আরও বারকতক শাসিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে।

এই কাহিনীর অন্তরালে একটি ইতিহাস আছে। বংশীবদন ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি পূর্ববঙ্গের কোন এক জমিদারের খানসামার কাজ করত। জমিদারের অতুল ঐশ্বর্য।

কিন্তু সেই সম্পত্তি ভোগ করবার কেউ নেই। কারণ জমিদার নিঃসন্তান। তাই বৃদ্ধ বয়সেও দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহণ করলেন তিনি, কিন্তু ভগবান বিমুখ। এই পত্নীরও কোন সন্তানাদি হল না।

তাছাড়া কোন দিক থেকে অসুখীর কোন কারণ ছিল না জমিদারের। সন্তান না হলেও বৃদ্ধ বয়সে তরুণী পত্নী লাভ করে সে ক্ষতি অনেকটাই পূরণ হয়ে গেছে তার।

কিন্তু সব সুখ আবার সকলের কপালে চিরদিন সয় না। বড় বৌ-এর লোকান্তর যাত্রার পর ঐ পথের দিকে তাকিয়ে জমিদারমশাই নিজের জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু ভাবনা নিজের জন্য ততটা নয় যতটা ঐ তরুণী পত্নী করুণাময়ীর জন্য। নিজের এই বিপুল সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর বারোজনে ভোগ করবে।

তার কতটুকু ভোগ করবে করুণাময়ী। চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন জমিদার। অবশেষে স্থির করলেন, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সোনাদানা নগদ টাকায় রূপান্তরিত করে করুণাময়ীর হাতে তুলে দিয়ে যাবেন। আর করলেনও ঠিক তাই।

বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যুর পর করুণাময়ী দেখলে যে সে দুটি জিনিসের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।

এক হল, তার বিপুল ঐশ্বর্য. আর দুই হল, তার নিজের ভরা যৌবন। কি এ জিনিস ভোগ করবে কে? করুণাময়ী মনে মনে এমন একজনকে কামনা করল যে তার রূপ যৌবন আর অসীম ঐশ্বর্যরাশি ভোগ করতে পারে। করুণাময়ী তার কামনার জাল

বিস্তার করল। আর সে জালে যাকে তুলে আনল সেই সৌভাগ্যবান —বংশীবদন।

বংশীবদনের এই লাভ পরিমাণের দিক থেকে যেমন বিপুল, সম্ভাবনার দিক থেকে তেমন অভূতপূর্ব এবং আকস্মিক।

রাজ্য আর রাজকন্যা লাভের যে ঘটনার কথা রূপকথা আর ইতিহাসের গল্পে শোনা যায়, ঠিক তেমনিই যেন ঘটল খানসামা শ্রীমান বংশীবদন ঘোষের কপালে। বংশীবদন আনন্দিত।

কিন্তু বংশীবদনের বুঝি ভাগ্যের দোষ ছিল। তাই যে দুটি জিনিস তার অপ্রত্যাশিত লাভ, সে দুটি একটিকে অচিরেই হারাতে হল। রাজ্য মিললেও রাজকন্যাটি মাত্র দুদিনের জ্বরে বংশীবদনকে ছেড়ে গেল।

সুতরাং তখন করুণাময়ীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল বংশীবদন। সুন্দরী পত্নী হারালেও মোটের উপর লাভই হল বংশীর। সে তখন সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে চাকুরীস্থল ছেড়ে নিজগ্রাম রাধাগঞ্জে এসে উঠল।

রাধাগঞ্জে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে লাগল বংশীবদন। নিজের ধন সম্পত্তির কথা এতকাল সে গোপনই রেখেছিল। কিন্তু তার তিন পুত্র যখন ঐ সম্পত্তি লাভ করল, তখন তা আর গোপন থাকল না।

রামকান্ত, রামকানাই ও রামগোপাল। বড় রামকান্ত অত্যন্ত হিসেবী। নিজের বিষয়সম্পত্তি সে বহুগুণে বাড়িয়ে ফেলল। কিন্তু মেজ রামকানাই তার দাদার একেবারে বিপরীত। ভোগের দিকে তার লক্ষ্য বেশী। অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপন করতো। মনোরম বাগান বাড়ি আর দামী আসবাবপত্রে সে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ফেললে।

এ ধরনের মানুষের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে রামকানাই-এর ভাগ্যেও তাই-ই ঘটল। যে সব ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে তার দিন কাটতো, তারাই তাকে কলকাতায় যাবার জন্যে উৎসাহিত করল। সেখানে

টাকা উড়িয়ে সুখ, দেদার খরচ কর আর অফুরন্ত ফূর্তি লুটে বেড়াও। রামকানাই করলোও তাই। কলকাতা সহর তো নয় যেন ইন্দ্রপুরী। সেখানে না গিয়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পুকুর খুঁড়ে, বাগান তৈরী করে টাকাগুলো কেন অনর্থক জলে দিচ্ছে রামকানাই। আর তাছাড়া কলকাতায় গেলে রোজগারের একটা হিল্লে হয়। সেখানে টাকায় টাকা আনে! তেমন একটা ব্যবসা করতে পারলে, হাজার টাকা হেলায় খেলায় উপায় করবে।

বন্ধুরা এমনতর পরামর্শই দিতে লাগল তাকে। আর তার ফল-স্বরূপ সমস্ত বিষয় সম্পত্তি খুইয়ে সর্বস্বান্ত হল রামকানাই।

রামকান্ত মৃত্যুর আগে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁর একমাত্র পুত্র মথুরমোহনকে দিয়ে গেলেন। আর রামকানাই-এর পুত্র মাধব পিতার বিষয় সম্পত্তি কিছুই পায়নি।

কিন্তু সে পেয়েছিল কলকাতার পরিবেশে লেখাপড়া করবার সুযোগ। আর এই সুযোগ সে নিষ্ঠার সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করেছিল।

রামকানাই, পুত্র মাধবের জন্য বিষয় সম্পত্তি কিছুই রেখে যায়নি সত্যি, কিন্তু মাধব তার পিতামহ বংশীবদনের সম্পত্তি থেকে একে-বারেই বঞ্চিত হয়নি। বংশীবদনের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল নিঃসন্তান ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি তিনি মাধবকেই দিয়ে যান।

মৃত্যুর পূর্বে রামকানাই মাধবের বিয়ে দেন এক দরিদ্র কায়স্থের বাড়িতে। ঐ দরিদ্র কায়স্থের দুটো সুন্দরী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা মাতঙ্গিনী আর কনিষ্ঠা হেমাঙ্গিনী। মাতঙ্গিনী হল রাজমোহনের বৌ। আর হেমাঙ্গিনীর সাথে বিয়ে হয়েছিল মাধবের।

রামগোপাল বংশীবদনের কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি সযত্নেই রেখেছিলো। সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করল মাধব। রামগোপালের মৃত্যুর পর ঐ সকল বিষয় দেখাশোনার জন্য মাধবকে কলকাতা থেকে ফিরে এসে নিজগ্রাম রাধাগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হল।

ফেরবার পথে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে দিন কয়েকের জন্য দেখা সাক্ষাৎ করতে এল মাধব। রাজমোহন ও তার স্ত্রী মাতঙ্গিনীও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। ভাগ্যক্রমে তাদের সাথেও দেখা হয়ে গেল মাধবের।

রাজমোহনের আর্থিক অবস্থা খুব বেশী ভাল নয়। তবে সে কর্মঠ। দিন তার চলে যেত কোনমতে। মাতঙ্গিনী কনিষ্ঠা ভগিনী হেমাঙ্গিনীকে কাছে পেয়ে, তার কাছে একটা প্রস্তাব করে বসল। মাধব জমিদার। রাজমোহনকে তার জমিদারীতে একটা চাকরী দিতে।

—তাতো—পারেই! খুব পারে। হেমাঙ্গিনী দিদির কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল—আমি এখুনি তাঁকে গিয়ে বলছি—

হেমাঙ্গিনী মাধবকে সব কথা খুলে বলল।

শুনেই ভ্রূকুঞ্চিত করল মাধব।

মাধব রাজমোহনের রুক্ষ স্বভাবের কথা আগে থেকেই জানত, তাই তাকে কাজ দেবার ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহ দেখাল না। কিন্তু হেমাঙ্গিনী ছাড়ার পাত্রী নয়। তাই শেষ পর্যন্ত নিজের জমিদারীতে রাজমোহনকে একটা কাজ জুটিয়ে দিলো মাধব।

রাজমোহনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। আসলে রাজমোহনের একটা দুষ্ট মতলব ছিল। তাই সে মাতঙ্গিনীর মারফৎ শ্যালিকা হেমাঙ্গিনীর সাহায্যে কাজটা হাসিল করে নিয়েছে সহজেই। কিন্তু রাজমোহনের গোপন অভিসন্ধির কথা জানত না মাতঙ্গিনী।

শ্বশুরবাড়িতে কয়েকদিন থাকবার পর মাধব নিজ গ্রাম রাধাগঞ্জে ফিরে এল। সেই সঙ্গে এল রাজমোহন আর মাতঙ্গিনী।

মাধব বাড়ি ফিরেই মোটা মাইনের একটা কাজ দিলেন রাজামোহনকে। পরিশ্রম তাতে নেই বললেই চলে। চাষ আবাদের জন্য একটা নিষ্কর জমি আর একটা সুন্দর গৃহ নির্মাণ করে দিলেন মাধব।

এই গৃহের সঙ্গে খানিক আগে আমরা কনক আর হেমাঙ্গিনীর সাথে পরিচিত হয়েছি। আর বাগান বাড়িতে মথুর আর মাধবের

কথাবার্তাও আমরা শুনেছি। মথুরের সাথে আলাপ করে নিজ গৃহে ফিরে এল মাধব। ফিরে এসে দেখল, তার নামে একটি চিঠি এসেছে। মাধব চিঠিটা পড়তে লাগল। চিঠিতে লেখা আছে—

মহামান্যবরেষু,

এই মোকামে আমি আপনার মামলার কার্যাদি তদ্বিরের কাজে নিযুক্ত আছি। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার খুড়ী ঠাকুরাণী আপনার নামে এই বলিয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন যে, তাহার স্বামী রামগোপাল তাহার সমুদয় বিষয় সম্পত্তি আপনাকে দান করিয়া যান নাই। উইল জাল। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সমস্ত সম্পত্তি আপনার খুড়ী ঠাকুরাণীকে ফিরাইয়া দিবার দাবী করা হইয়াছে।

যতদূর মনে হয়, আপনার খুড়ী ঠাকুরাণীর পিছনে যে কোন মন্ত্রদাতা আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। অধীনের এই নিবেদন, আপনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সকল বিষয়ে বিবেচনা কবিবেন। আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিব না।

ইতি ভবদীয়—

চিঠি খানা পড়ে রাগে-ক্ষোভে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে মাধব। তখন সে অন্দরমহলে ছুটে এল। খুড়ীমাকে মুখোমুখিই জিজ্ঞাসা করবে মাধব, এমন জঘন্য কাজে কেন লিপ্ত হলেন তিনি। কার কু-পরামর্শে তার এই ঘৃণ্য অভিযোগ, তাও জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করবে না মাধব।

বাড়ির মধ্যে এসে খুড়ীমার সন্ধান করল সে। কিন্তু তাঁর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। একজন ঝি এসে বলল,—খুড়ীমাকে সে বড় বাড়িতে দেখেছে সকাল থেকে।

মাধবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বড় বাড়ি মথুরদার। তবে কি মথুরদাই কু-মন্ত্রনা দিয়ে খুড়ীমাকে বিপথে চালিত করছে।

মাধব চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখুনি মথুরমোহনের বাড়িতে একজন ঝি পাঠিয়ে দিল,—বলল, যা এক্ষুণি ডেকে আন খুড়ীকে।

॥ তিন ॥

রাজমোহনের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়ে মাতঙ্গিনী সেই যে সন্ধ্যার সময় তার শোবার ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে, অধিক রাত পর্যন্তও সেই খিল সে আর খোলে নি। রাত্রির খাবার প্রস্তুত। পিসি এসে অনেক সাধাসাধি করল, ননদ এসে কত অনুনয় বিনয় করে রাত্রির খাবার খেয়ে নিতে বলল, কিন্তু কোনই ফল হল না! দরজা খুলল না মাতঙ্গিনী।

মাতঙ্গিনী জানে রাজমোহন আজকে এই ঘরে আর শুতে আসবে না। যেদিন রাগ পঞ্চমে উঠে যায়, সেদিন একা থাকতে হয় মাতঙ্গিনীকে। তাতে মাতঙ্গিনীর ভালই লাগে। প্রতিদিনের মত দীর্ঘ রাত্রি ধরে দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে স্বামীর প্রতীক্ষা করতে হয় না তাকে। সকাল সকাল ঘরে গিয়ে দোর এঁটে শুয়ে পড়লেই হল। সে রাত্রির মত নিশ্চিন্ত মাতঙ্গিনী।

একে গ্রীষ্মের গরম। তাতে মনের অশান্তিতে ঘুম আসছিল না মাতঙ্গিনীর। একটা খোলা জানলার ধারে শুয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। এমনি সময় হঠাৎ বাইরে কারা যেন কথা কইছে মনে হল। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো মাতঙ্গিনী। বাইরে থেকে ফিস্ ফিস্ করে একটা চাপা কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। বিছানায় উঠে বসল সে। ওদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল।

বাইরে দুজনের কথাবার্তা সে এতক্ষণে স্পষ্ট শুনতে পেল। একজনের কণ্ঠস্বর অতি পরিচিত, সে কণ্ঠস্বর তার স্বামীর। কিন্তু আর একজনের কণ্ঠস্বর অপরিচিত।

কিন্তু এতরাত্রে কী সলাপরামর্শ করছে ওরা। মাতঙ্গিনী শুনতে পেল অপরিচিত লোকটি বলছে—তা আর কোন জায়গা পেলে না। একেবারে ঘরের দোরে এনে তুললে দেখছি!

রাজমোহন বলল, ঘর আবার কোথায়? চারিদিকে তো জংগল।

—তবে এই ঘরটা কিসের? যে ঘরটায় মাতঙ্গিনী ছিল সেই ঘরটাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। লোকটা বলল, দেওয়ালেরও কান আছে জানতো?

—আরে এতো আমার নিজের শোবার ঘর। কোন ভয় নেই তোমার।

—তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই থাকে এ ঘরে?

—হ্যাঁ, তা তো থাকেই! তবে তার জন্য আর তোমার ভাবনা কি। সে তো এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অপরিচিত লোকটার মনের সন্দেহ গেল না। বলল, ঘুমোচ্ছে, তা কি তুমি ঠিক জানো? সে নাও তো ঘুমোতে পারে।

—আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও। আমি এখুনি দেখে আসছি।

মাতঙ্গিনীর আগ্রহটা বেড়ে গেল—ব্যাপারটা কি তার জানতেই হবে—সে ঘুমানোর ভান করলো।

রাজমোহন বাড়ির ভেতর এল! প্রথমেই সে তার শয়ন কক্ষের দরজায় মৃদু করাঘাত করল। কিন্তু ভেতরে কোন জাগ্রত মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। বাইরে থেকে ভেতরের আগল খোলবার কায়দা ছিল রাজমোহনের।

রাজমোহন খিল খুলে নিঃশব্দে ঘরের ভেতর গেল। ঘরের স্তিমিত আলোয় দেখতে পেল, শয্যায় শুয়ে আছে মাতঙ্গিনী। গভীর নিদ্রায় মগ্ন সে। রাজমোহন আস্তে আস্তে ডাকল কিন্তু মাতঙ্গিনীর ঘুম ভাঙল না তাতে।

মাতঙ্গিনী ঘুমোচ্ছে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার পর সে শয্যাগৃহের বাইরে এল। বাড়ির অন্যান্য সকলে ঘুমোচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে সন্দেহ মুক্তো হলো। তারপর বেরিয়ে এসে লোকটাকে বলল, কোন ভয় নেই। সবাই ঘুমে অচেতন। এবার আমরা আলোচনা করতে পারি।

—তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছো?

—না। বলল রাজমোহন। খুব যে একটা রাজী তা নয়।

—কেন? সে তো তোমার খুব হিতৈষী বলে মনে হয় না।

—ওকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না এটা ঠিক। তবে কি জানো, ও আমার অনেক উপকার করেছে।

—যেমন উপকার করেছে, তেমন ক্ষতিও করেছে কম না।

—তা করেছে! তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশী।

—তবে আমাকে সাহায্য করতে রাজী হচ্ছ না কেন? লোকটা আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল রাজমোহনকে।

—না। গররাজী হব কেন। আমার পারিশ্রমিক যদি মোটা রকম হয়, গররাজী হবার কোন কারণ নেই তো!

—কত চাও তুমি? লোকটা এবার সরাসরী জিজ্ঞেস করল।

—তাহলে আসল কথাটা গুছিয়ে বলি শোন। আমার আর এখানে থাকতে মোটেই ইচ্ছে করছে না।

আমার নিজের গ্রামে গিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে চাই। তবে আমার এখন যা অবস্থা তাতে গ্রামে গিয়ে বসবাস করা আর সম্ভব নয়, যদি এখান থেকে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যেতে না পারি। সেই জন্যই আমি বলছি, আমায় কিন্তু বেশ মোটা রকম পারিশ্রমিক দিতে হবে।

—বেশ তো দোবো। এখন শোন কী কাজ করতে হবে তোমায়।

—কী কাজ?

—খুব বেশী শক্ত কাজ নয়। ওদের বাড়ি থেকে সোনাদানা টাকাকড়ি যত কিছু পাবো সরিয়ে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখবে তোমার ঘরে। পারবে তো?

—নিশ্চয় পারবো। কিন্তু এ কাজটা বুঝি খুব সহজ হল। তাহলে তোমরাই তো পারো। আমাকে টানছো কেন?

—না। খুব সহজ নয়। মানে অন্যের কাছে যা খুব কঠিন, তোমার কাছে তা খুব সহজ। তাই বলছিলাম, কি দিতে হবে তাই বলো।

—যা মাল সরাবো, তার সিকি দিতে হবে আমায়। আর পারিশ্রমিক টাকাটা আমায় আগাম দিতে হবে?

—কেন? আমাদের বিশ্বাস কর না বুঝি। মাল পেলেই পালিয়ে যাবো, আর তোমার পাওনা মেটাবো না?

—না না, সে কথা কে বলছে? এখানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে যা নিয়ম তাই বললাম।

—আচ্ছা ঠিক আছে। তাই পাবে। লোকটা বলল—আর একটা কাজ করতে হবে

—কী কাজ?

—মাধব ঘোষ তার উইলটা কোথায় রেখেছেন বলতে হবে।

—এর জন্য কত দেবে?

—একশো।

—না, এ আমি পারবো না।

—পারব না মানে—কত চাই? তাই বলো—।

—তা কম করেও পাঁচশো।

—খুব চড়া মজুরী হাঁকলে! বেশ তাই দেবো। বল কোথায়?

—আমায় বলতে হবে কে এসব করাচ্ছে। মথুর ঘোষ?

—বঃ। বারণ। ওসব অকেজো কথার সময় নেই। শিগ্‌গির বল। লোকটা তাড়া দিল।

রাজমোহন বলল—হাতীর দাঁতের একটা বাক্সের ভেতর রাখে উইল। আর সে বাক্সটা ওর শোবার ঘরের আলমারিতে আছে।

—বেশ চল এবার। আমাদের দলের আর সবার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দিই। রাতের চাঁদ ডুবলেই অন্ধকার নেমে আসবে। আর সেই অন্ধকারে কাজ হাসিল করবো আমরা।

দুটি লোকের পদ-শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে মাতঙ্গিনী। সে আর

স্থির থাকতে পারল না। মেঝের ওপর বসে পড়ল। একটা সর্বনাশা ছবি ভেসে উঠলো তার চোখের ওপর।

কিন্তু দুঃস্বপ্নের ঘোরে আর বেশীক্ষণ কাটাতে পারল না সে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় আর ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো। ছিঃ ছিঃ, তার স্বামী ডাকাত! দস্যু দলের সাথে যোগাযোগ! এই বর্বর স্বামীর সাথে এতকাল বাস করে এসেছে সে। এতকাল রাজমোহনের উৎপীড়ন সহ্য করেছে মাতঙ্গিনী। কিন্তু আজ?

আজ সে দেখতে পেল তার স্বামী দস্যু—অর্থ পিশাচ। রাজমোহন দস্যুবৃত্তি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আর তার দস্যুবৃত্তির শিকার কিনা তার প্রাণাধিক প্রিয় ভগিনী আর ভগ্নিপতি! যেমন করেই হোক্ এদের রক্ষা করতে হবে। উপায় কি?

মাতঙ্গিনী ভাবল, বাড়ির সবাইকে ডেকে ঘটনাটা জানিয়ে দেব। পিসি, ননদ সবাইকে বলে এর একটা বিহিত করে এখুনি! কিন্তু পিসি আর ননদ কি বিশ্বাস করবে যে রাজমোহন ডাকাত! ওরা পাগল বলবে মাতঙ্গিনীকে।

কনকের কাছে যাবে ঠিক করলো মাতঙ্গিনী। কনককে গিয়ে সব কথা খুলে বলবে সে। তারপর তাকে পাঠিয়ে দেবে মাধবের বাড়িতে।

না, তাতেও সুবিধে হবে না মাতঙ্গিনীর। কনকের সাহায্য পাওয়া গেলেও, কনকের মা ভীষণ মুখরা মেয়েমানুষ। সে সব কিছু খুঁটিয়ে জানতে চাইবে। না তাতে বিপদ আরো বাড়বে। আর তখন রাজ-মোহনের কথাও প্রকাশ পেয়ে যাবে। ফলে রাজমোহনও জড়িয়ে পড়বে ঘটনাটিতে।

মাতঙ্গিনী তাই ঠিক করল, যা সে করবে, তা তাকে একাই করতে হবে। আর করতে হবে এখুনি। কথাটা ভাবতেই সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ভয়ে। এই গভীর রাত্রে একাকি সে মাধবের ঘরে যাবে। যদি কু-লোক দেখতে পায় মাতঙ্গিনীকে? তারা যদি কোন ক্ষতি করে বসে?

করুক, প্রাণের মায়া করবে না সে। এখুনি বেরিয়ে পড়বে সে। চাঁদ ডুবতেও আর বেশী দেরী নেই। মাতঙ্গিনী প্রস্তুত হয়ে নিল।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সে। আসবার সময় দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করতে ভুলল না। মাধবদের বাড়িতে যাবার একমাত্র সহজ পথ আমবাগানের ভেতর দিয়ে। সেই বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে প্রতিমুহূর্তে শংকায় হিম হয়ে আসতে লাগল সর্বাঙ্গ। এই অন্ধকারে চোর-ডাকাত আর হিংস্র-জন্তুব ভয় তো আছেই, কিন্তু তবুও দ্রুত এগিয়ে চলল মাতঙ্গিনী।

চলতে চলতে হঠাৎ একটা জায়গায় এসে মাতঙ্গিনী থমকে দাঁড়ালো। সে অনতিদূরে দেখতে পেল কয়েকটা লোক ফিস ফিস করে কী সব পরামর্শ করছে।

মাতঙ্গিনী ভাবল ফিরে যাবে সে। ঐ দস্যুদের নজরে পড়লে মাধবের তো কোন উপকার করতে পারবেই না—বরং তার নিজেব প্রাণটা যেতে পারে। কিন্তু এই পথ ছাড়া অন্য পথে মাধবের বাড়িতে যেতে যে অনেক সময় লাগবে! কী করবে মাতঙ্গিনী।

লোকগুলো হঠাৎ এদিক ওদিক সরে গেল কেন? মাতঙ্গিনীর উপস্থিতি বুঝি টের পেয়েছে ওরা। তাই ওরা অমন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মাতঙ্গিনী আর মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ করল না। সে দ্রুত বাগান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা পুকুরের পাড় ধরে ছুটতে লাগল। কিন্তু কি সর্বনাশ—সে পিছন ফিরে তাকাল, দেখতে পেল কয়েকজন লোক তারই দিকে এগিয়ে আসছে কিন্তু এই বিপদেও দিশেহারা হলো না মাতঙ্গিনী।

পুকুর পাড়ের যে বটগাছটার ছুটো ডাল পুকুরের জলের ওপর এসে পড়েছে আর সেখানে জমে রয়েছে ঘন অন্ধকার মাতঙ্গিনী সেই শাখা ধরে পুকুরে নামল। সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে দিলো জলে, কেবল মুখটা বার করে থাকল। কিন্তু মুখ এত ফর্সা যে অন্ধকারেও নজরে পড়তে পারে ওদের। তাই মাথার এলোচুলগুলো দিয়ে মুখ ঢাকে মাতঙ্গিনী।

দীঘির কালো জল কালোছায়া আর কালো চুলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন লোক এসে দাঁড়াল পুকুর পাড়ে। তারা আশে পাশের ঝোপঝাড় আর বটগাছের তলায় ভাল করে খুঁজেও কিছু দেখতে পেল না।

লোকগুলোর পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার কিছু পরে দীঘি থেকে তীরে ওঠে সে। তারপর আমবাগানের পথ পরিত্যাগ করে দ্রুতপদে অন্যপথে মাধবের বাড়ির দিকে ছুটল।

॥ চার ॥

অতি সন্তর্পণে মাধবের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল মাতঙ্গিনী। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ তখন অস্তগমনোন্মুখ। মাধবের বাড়ির বাইরে একটা ঘরে থাকতো ঝি করুণা। তার দরজায় মৃদু করাঘাত করতেই করুণা জেগে উঠল। তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল—ওরে ব্যাটা চোর। চুরি করবার মতলবে যদি এসে থাকিস্ তবে এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না, তা আগেই বলে দিলাম।

মাতঙ্গিনী বিব্রত বোধ করল। মৃদুস্বরে বলল,—দরজা খোল করুণা। খুব দরকার—

—ওসব কথায় ভোলবার নই আমি। মানে মানে পালাও বলছি, নইলে আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করবো। করুণা আরও জোর গলায় বলল,— কি যাওনি তুমি, চেঁচালাম কিন্তু।

—করুণা লক্ষ্মীটি ভাই, চুপ কর। আমি হেমাঙ্গিনীর বোন!

কথাটাতে মন্ত্রের মত কাজ হল। দ্রুত দরজা খুললো করুণা, ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিস্মিত হতচকিত হয়ে গেল করুণা, বলল—আরে মা ঠাকরুণ যে! আর আমি ছাই কী আবোল-তাবোল বলছিলাম। তারপর এত রাত্রে কি মনে করে?

—শিগ্গির হেমাঙ্গিনীকে ডেকে দাও করুণা। তাকে আমার এখুনি দরকার।

—কি হয়েছে ঠাক্রুণ? করুণা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল—

—সে সব পরে শুনিস্ করুণা, আগে তাকে ডেকে দে। ব্যস্ত হয়ে উঠল মাতঙ্গিনী।

কিন্তু করুণা আবার জিজ্ঞেস করল—ওমা তুমি কোথায় গিছ্লে গো মাঠাক্রুণ? তোমার সারাটা গা ভিজে জব জব করছে।

—আঃ তুই আর দেরি করিস নে করুণা! আগে যা।

—এই যাচ্ছি! তুমি ততক্ষণ ভিজে কাপড়টা ছেড়ে দিয়ে এই শুকনো কাপড়টা পরে নাও মা।

একটা শুকনো কাপড় মাতঙ্গিনীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েই হেমাঙ্গিনীর শোবাব ঘরের দিকে ছুটল করুণা।

হেমাঙ্গিনী দিদির আগমনেব সংবাদ পেয়ে পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটে এল। মাতঙ্গিনীর কাছে এসে সে রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল. একি তুমি এত রাত্রে কেন দিদি? কোন বিপদ ঘটেনি তো?

—বিপদ আমার নয় হেম. বিপদ তোমাদের। আজ রাত্রেই ডাকাতি হবে তোমাদের বাড়িতে।

—ডাকাতি! কে বললে?

—হ্যাঁ, আমি জানি। তুমি শিগ্গির গিয়ে এখনই মাধবকে খবর দাও।

—ও বাবা। ও আমি পারবো না। হেমাঙ্গিনী ভয়ে রীতিমত আঁৎকে উঠল! আমার হাত পা কাঁপছে দিদি! আমি কিছুতেই তাঁকে গিয়ে এই কথা বলতে পারবো না।

কোন রকমে রাজি করিয়ে করুণাকে পাঠানো হল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল করুণা কাজ কিছু হলো না ওর-দ্বারা। করুণার কথা মাধব বিশ্বাসই করেনি। তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়বে, আর

সেই খবর দিতে এতরাত্রে একা-একা এসেছে মাতঙ্গিনী—এসব কি অসম্ভব ব্যাপার।

মাতঙ্গিনী আর বৃথা সময় নষ্ট করল না। সে নিজেই মাধবের শয়নকক্ষে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। দিদির সাথে স্বামীর সমীপে যেতেও রাজি হল না লজ্জাশীলা হেমাঙ্গিনী। অগত্যা সে একাই মাধবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করল—

একটা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বসেছিল মাধব। মাতঙ্গিনী ঘরে প্রবেশ করতেই সে সোজা হয়ে বসল। তারপর কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল।

—এসব যা শুনছি, তা কি সত্যি দিদি?

—সে কথা এখন জেনে কাজ নেই।

—তাই তো বড্ড ভাবিয়ে তুললেন দেখছি।

—আচ্ছা তোমার খুড়োমহাশয়ের উইলটা কোথায়?

—সে অত্যন্ত সংগোপনে সুরক্ষিত আছে।

তোমার এই শোবার ঘরের ভেতরে হাতীর দাঁতের বাক্সটাই কি সেই সুরক্ষিত গোপন জায়গা।

মাধব চমকে উঠল। অভিভূত বিস্ময়ে সে বলল, সেকি! আপনি জানলেন কি করে?

শুধু আমি কেন, ডাকাত দলের সবাই জানে এ খবর।

আচ্ছা আমি এসব ব্যাপারে এখুনি উচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। আপনি আর হেম অন্য একটি কামরায় দরজা বন্ধ করে থাকুন। আমি এখুনি আসছি।

—আর একটি কথা বলবো।

—কী কথা?

আমি আজ এখানে এসে তোমাকে খবর দিয়েছি তা যেন কেউ জানতে না পারে। আর করুণাকেও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিও।

মাধব সেই প্রতিশ্রুতি দিল মাতঙ্গিনীকে। তারপর সে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই মাধব তার সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি একটা গোপনকক্ষে স্থানান্তরিত করে ফেলল। চাঁদ ডুবে যাবার পর সমস্ত পল্লীটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। মাধবের ছাদের ওপর দেখা গেল একদল সুদক্ষ লাঠিয়াল। তারা সতর্ক দৃষ্টি আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি ছিল নিজ শিকারের প্রতীক্ষায়।

মাধব এমনিতে নিরীহ মানুষ। কিন্তু শত্রু দমনে সে বন্যপশুর চেয়েও হিংস্র। প্রয়োজনের সময় যাতে হাতের কাছে পায়, এজন্য সে তার সাহসী প্রজাদের বাড়ির সন্নিকটে তাদের ঘরবাড়ি করে দিয়েছিল। সুতরাং লোক সংগ্রহ করতে এতটুকুও বিলম্ব হলো না মাধবের। বাড়ির সদর দরজায়, বাড়ির ভেতরে ঢাল, সড়কি, বল্লম আর গাদা-বন্দুক নিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু কোনই সাড়াশব্দ নেই কোথাও। তবে কি মাতঙ্গিনীর কাছ থেকে পাওয়া খবর মিথ্যা? মাধবের মনে চকিতে সন্দেহ জেগে উঠল। কিন্তু সে সন্দেহ মুহূর্তেই নিরসন হয়ে গেল! দু'জন অনুচর এসে গোপনে মাধবকে খবর দিল যে তারা নিকটস্থ আমবাগানে একদল সশস্ত্র লোককে জমায়েত হতে দেখে এসেছে। ছাদের ওপর থেকে আমবাগানের আলোও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

মাধব ছাদের চিলে কুঠুরীর ওপর থেকে ডাকাতের আলো আর জটলার আঁচ পেল। মাধবের লাঠিয়াল সর্দার ভূপ সিং বলল, আমরা গিয়ে ওদের ওপর চড়াও হই কর্তা। ওরা এগোবার আগেই ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি ওদের।

—না ভূপ সিং। আমাদের গায়ে পড়ে লড়াই করার প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে দেখি যদি বিনা লড়ায়েই গোলমালটা মিটিয়ে ফেলা যায়, তাতে উভয় পক্ষেরই ভাল! মিছামিছি দু'দলের কিছু হতাহত করে লাভ কি?

—তবে কী শুধু এই বাড়ি আগলেই থাকবো হুজুর ?

—না। তোমরা চীৎকার করে জানিয়ে দাও, আমরা প্রস্তুত।

মাধবের কথার সাথে সাথে সমস্ত লাঠিয়াল এক সাথে প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমবাগান থেকেও সমবেত চীৎকারের শব্দ ভেসে এল দিগন্ত কম্পিত করে। আবার মাধবের লোকেরা চীৎকার করল। ডাকাত দলও উত্তর দিল।

আবার—বহুবার।

মাধবের ছাদের ওপর থেকে বন্দুকের আওয়াজ হল বার দুই। আর সেই সঙ্গে সকলে প্রচণ্ড শব্দে চীৎকার করে উঠল, হুঁশিয়ার।

এইবার আমবাগানের ভেতর থেকে পালানোর শব্দ শুনে মাধব বলল—ঐ যে পালাচ্ছে ওরা—পালাচ্ছে···

মাধবের লোকেরা আবার চীৎকার করে উঠল—দুয়ো। দুয়ো।

ডাকাতেরা পালিয়ে গেলেও সে রাত্রের মতো সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেই অন্দরমহলে চলে এল মাধব।

যে মহীয়সী আজ তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করল, তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চলল মাধব।

॥ পাঁচ ॥

ডাকাতেরা সব পালিয়ে গেছে। মাতঙ্গিনী আর হেমাঙ্গিনীর ভয়ও অনেকটা কেটে গেছে সেই সাথে। এখন কেবল এই প্রসঙ্গেই উত্তেজিত আলোচনা চলছিল দুই বোনের ভিতর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল মাধব।

মাধব ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জে ঘোমটা টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল হেমাঙ্গিনী। মাধব মাতঙ্গিনীর দিকে সকৃতজ্ঞ করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, আপনার উপকারের কথা কোনদিন ভুলবো না দিদি। আজকে আপনি আমাদের যে প্রচণ্ড সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচালেন, তার জন্য চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

মাতঙ্গিনী চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমি অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আজ এখানে এসেছি। তুমি করুণাকে আমার সঙ্গে দিলে বিশেষ সুবিধা হবে। তাই কর।

মাধব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মাতঙ্গিনীর দিকে। সেকি! কতদিন পরে এলেন, কোথায় দু'চার দিন থাকবেন, তা নয়, রাতটুকু পোয়ানোরও তর সইবে না, এখুনি যাওয়া চাই। রাজমোহনবাবু কি এখনই ফিরে যাবার জন্য বলেছেন?

মাতঙ্গিনী অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল মাধবের দিকে। বলল—তিনি কিছু বলেন নি। আমি তাঁকে না জানিয়েই এসেছি চুপি চুপি।

—আপনি এসেছেন, অথচ সেকথা রাজমোহনবাবু জানেন না। এ কেমন কথা। রাজমোহনবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

একথা শুনে মাথা নত করল মাতঙ্গিনী। সে শুধু অস্ফুটে বলল, সে কথা থাক, দয়া করে ওকথা কোনদিন জিজ্ঞেস করো না।

মাধব পরম বিস্মিত হল। তার মনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারতে লাগল। তবে কি রাজমোহন এসব ঘটনার কিছু জানেন না? না, রাজমোহনও এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

মাধব নির্বাক হয়ে রইল। মাতঙ্গিনী এবার বলল, আর দাঁড়াই কেন তাহলে! এবার চলি। বিদায়···

মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর রোধ হয়ে আসে। ঠোঁটও বুঝি কেঁপে ওঠে তার। মাধব হতচকিত হয়ে তাকায় তার দিকে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—ওকি। আপনি কাঁদছেন কেন দিদি?

মাতঙ্গিনী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে মাধবের দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। তারপর ব্যাকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে বলতে লাগল, আমি সত্যিই তোমায় ভালবেসে-ছিলাম মাধব। এই দীর্ঘদিন প্রতিমুহূর্তে আমি সে ভালবাসার জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মরেছি। কিন্তু ইহজীবনে আর তোমাকে কাছে পাবো, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি মাধব।

কথা শুনে মাধবও চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মাতঙ্গিনী অশ্রুসজল নেত্রে বলল, আর বোধহয় কোনদিনই তোমার সাথে আমার দেখা হবে না। এই আমাদের শেষ দেখা। ব্যর্থ ভালবাসার জ্বালা নিয়ে এমনি জন্মান্তকাল জ্বলেপুড়ে মরবো আমি। এ জ্বালা আমার কোনদিনই মিটবে না মাধব। তাই যাবার আগে শেষবারের মতো একটি কথা জানতে চাই তোমার কাছে। তুমি আমায় ভালবাস কিনা, শুধু এই কথাটুকু বল মাধব। বল, চুপ করে থেকো না।

মাধব অস্থির হয়ে উঠল। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলে না। ইচ্ছে হল মুহূর্ত মাতঙ্গিনীকে নিকটে আকর্ষণ করে। নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে ইচ্ছাও দমন করে নিল মাধব। কিন্তু বেদনায় আব আবেগ কণ্ঠে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল তারও। বলল—আমিও ভালবাসি তোমায় মাতঙ্গিনী—আমিও তোমায় খুব ভালবাসি। যেদিন তোমায় আমি প্রথম দেখলাম, সেদিন থেকেই মনে মনে তোমায় ভালবেসে ফেলেছি।

আমিও যে সেদিন থেকেই তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছি মাধব। সেদিন থেকেই প্রেমের অনলে জ্বলেপুড়ে মরছি আমি। আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল মাতঙ্গিনী। মাধবও তখন কাঁদছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছিল মাধব। তাকে বলল, এ নিয়ে আব দুঃখ পাবার কোন মানে হয় না মাতঙ্গিনী। আমাদের মিলনের যখন কোন পথই নেই, একেবারেই অসম্ভব, তখন আমাদের দুজনকে দুজনার ভুলে থাকাই একান্ত দরকার।

বেশ তাই করবো মাধব! তোমাকে ভোলবার চেষ্টা করবো আমি। যদি না পারি তবে তোমার বিরহের যন্ত্রণাই হবে আমার শয়নে-স্বপনে, নিশীথ-জাগরণের একমাত্র সাথী। চিরবিদায় নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি আজ। আমাদের আর দেখা হবে না কোনদিন।

তুমি আর হেমাঙ্গিনী সুখী হও—মাধব, পরম পিতার কাছে এই আমার প্রার্থনা।

কাপড়ের আঁচল দিয়ে দু'চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাতঙ্গিনী।

॥ ছয় ॥

তখনও প্রভাত হতে একঘণ্টা বাকী। করুণাকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামল মাতঙ্গিনী। ডাকাতের হাতে ধরা পড়বার আর ভয় নেই। ডাকাতেরা নিশ্চয়ই সেই আমবাগানে আর বসে নেই। করুণাকে সঙ্গে নিয়ে মাতঙ্গিনী তাই আমবাগানের সোজা পথ ধরে এগিয়ে চলল।

মাধবের ভাবনা তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মাতঙ্গিনীর হৃদয়-মন। অথচ এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করে এল সে। মাধবকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে, কিন্তু মাধবের মুখটা কেবলই চোখের ওপর ভেসে উঠে বার বার মনে পড়ে তার স্মৃতি! "আমি তোমায় খুব ভালবাসি মাতঙ্গিনী" —মাধবের এই মধুর কণ্ঠধ্বনি যেন এখনও কানে বাজছে মাতঙ্গিনীর।

দূর আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড়ের পূর্বাভাস। করুণা বলল—তাড়াতাড়ি পা চালাও মা ঠাকৃরুণ, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে এখুনি।

—তাই হবে মনে হচ্ছে। মাতঙ্গিনী চলার গতি দ্রুত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কয়েক পা না এগোতেই বেশ বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল।

করুণা দৌড়াতে শুরু করল, বলল—ছুটে এসো। বৃষ্টিতে ভিজে আবার অসুখে পড়ে না যাই শেষে।

দুজনে প্রাণপণ ছুটতে ছুটতে খানিক বাদেই গৃহপ্রাঙ্গণে এসে পৌঁছুল। কিন্তু গৃহের চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ঘুমে সবাই অসাড়, রাজমোহন নিশ্চয়ই এখনও ফিরে আসেনি। শোবার ঘরের দরজাও বন্ধ। অনেকটা নিশ্চিন্ত হল মাতঙ্গিনী। মনে মনে ভাবল

রাজমোহন ফিরে এসে নিশ্চয়ই ঘর-দোর বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকবে না। ঘর-দোর মাতঙ্গিনী যেভাবে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বন্ধ রয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত হল।

ঘরের দাওয়ায় উঠে করুণাকে ফিবে যেতে বলল। কিন্তু এই শেষ রাত্রে ওকে একা অতদূর মাধবের গৃহে পাঠান ঠিক হবে কি না এই কথা ভাবল মাতঙ্গিনী। তারপর বলল—তুমি না হয় আশেপাশে কোথাও আজকের শেষ রাতটুকু কাটিয়ে যাও।

—হ্যাঁ মা। আমি তাই করবো ভাবছি! বলল করুণা। এ গ্রামের মিত্তির মশাই আমাদের খুব জানা লোক, তার বাড়ির দাওয়াতেই না হয় আজকের এই রাতটুকু কাটিয়ে দেবো।

—তাই ভাল!

করুণা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর মাতঙ্গিনী তার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা বন্ধ। যেমন রেখে গেছে ঠিক তেমনই আছে। খুলে ফেলল মাতঙ্গিনী।

ঘরের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে আস্তে আস্তে কুলঙ্গীর কাছে গিয়ে আলো জ্বালবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ আপনা হতেই দরজার আগল বন্ধ হয়ে গেল।

চমকে উঠল মাতঙ্গিনী। উচ্চৈস্বরে চাৎকার করে বলল—কে?

—আমি!

চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা যে কার তা আর চিনতে এক মুহূর্তও বাকী রইল না মাতঙ্গিনীর। ভয়ে আতঙ্কে সে পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজমোহন দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় গিয়েছিলি এত রাত্রে? কোন উত্তর দিলো না মাতঙ্গিনী। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে ভয়ে রক্ত জল হয়ে আসে তার। কিন্তু তাই বলে বেশি ভয় পেলে চলবে না। এতে রাজমোহন আরও হিংস্র হয়ে উঠবে। মাতঙ্গিনী মনে সাহস সঞ্চয় করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আবার বজ্রকণ্ঠে চীৎকার—মাধব ঘোষের বাড়ি কেন গিয়েছিলি বল?

—ডাকাতের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।

—চুপ কর হারামজাদী। মিথ্যে বলবার জায়গা পাস্‌নি তুই? দৃপ্তকণ্ঠে রাজমোহন বলল, মাধব ঘোষের প্রচুর অর্থ আর সুন্দর চেহারা দেখে ভুলেছিস তুই। এত রাত্রে তুই নিজের ঘর ছেড়ে পরের বাড়ী যাস্ কুলটাপনা করতে। জেনে রাখ, তোব গতিবিধি আমি সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখি।

—তুমি আমায় ভুল বুঝো না! মাধবকে আমি ভালবাসি একথা সত্যিই। কিন্তু তাই বলে তাব প্রতি আমি আসক্ত নই।

বাজমোহন বলল—দেখ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না। সব সময় তোর পিছু পিছু আমি নজর রাখি। সেদিন জল আনবার অছিলায় মাধবের সাথে দেখা করে এসেছিস তাও আমি জানি।

—উঃ এসব মিথ্যা কথা। মাতঙ্গিনী চীৎকার করে বলল।

—চুপ কব! রক্তবর্ণ চক্ষু করে আবার শাসিয়ে দিল রাজমোহন।

—মনে রাখিস বেয়াদপির একটা সীমা তুই ছাড়িয়ে উঠেছিস্। তোর রূপ আছে একথা সত্য। তুই সুন্দরী তাও মানি। তার জন্য আমার মনে একটা আহ্লাদ ছিল, অহংকার ছিল। আমি তোকে একান্ত কাছে পেতে চাই, ভালবাসতে চাই, নিগূঢ়ভাবে তোকে নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর-সংসার করতে চাই। কিন্তু তুই কুলটা, আমার ঘর ভাঙবারই সর্বনাশা ইচ্ছা হয়েছে তোর—

মাতঙ্গিনী আবার অশ্রুসজল কণ্ঠে বলল,—মিথ্যা, এ সবই মিথ্যা।

—চুপ কর শয়তানী। হিংস্র শার্দুলের মতো রক্ত চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে রাজমোহনের। সে বলে—তোকে আমি খুন করবো! যে রূপের জ্বালায় আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিস এতদিন, সেই রূপের দেমাক এই দুই হাতে দলিত মথিত করবো আমি।

—আঃ—অস্ফুট চীৎকার!

—তোর নামে এ গ্রামে কলঙ্ক রটার আগেই তোকে শেষ করবো আজ! পাপিষ্ঠা! রাজমোহন দুটো শক্ত হাত দিয়ে মাতঙ্গিনীর গলা সজোরে চেপে ধরে।

প্রাণপণে সেই নরাধমের কঠিন হস্তমুষ্টি থেকে মুক্ত হবার জন্য বারবার চেষ্টা করতে থাকে সে। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় রাজমোহনের বজ্রমুষ্টি। চারিদিকে ঘন আঁধার নেমে আসে, দম আটকে আসছে। প্রাণবায়ু বুঝি বেরিয়ে যায় তার। দু'চোখের কাতর অশ্রু বিনিময়ে প্রাণভিক্ষা চায় সে। কিন্তু রাজমোহন নির্দয়-নিষ্ঠুর হস্তে তাহার গলদেশ নিষ্পেষণ করতে থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে জানালাটা একটা প্রকাণ্ড আঘাতে হুড়-মুড় করে ভেঙে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে এসে ঢোকে দুইজন ষণ্ডামার্কা মানুষ। সারাটা দেহ তাদের বাইরের অঝোরে ঝরা বৃষ্টির জলে সিক্ত।

॥ সাত ॥

হঠাৎ এভাবে রাজমোহনের ঘরে লোক ছুটে ঢোকবার জন্য আঁতকে উঠল সে। মাতঙ্গিনীর কাছ থেকে ছিটকে দূরে সরে চীৎকার করে বলল—কে তোরা?

চুপ কর বেইমান! যত সব বীরত্ব ঘরের ভেতরই তোর? একজন জিজ্ঞেস করল—বল, বৌকে এভাবে হত্যা করছিলি কেন?

—সে কৈফিয়ৎ তোদের দেব না শয়তান। রাজমোহন গর্জে উঠল, তোদের কি মতলব সে কথা আগে আমায় বল। ডাকাতি করবার ইচ্ছা থাকলে তবে মান নিয়ে সরে পড়, এখানে খুব বেশী সুবিধে হবে না তোদের!

যাঃ! তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল—'কী লক্ষ টাকা আছে তোর ঘরে যে ডাকাতি করবো?' আগে বল, কেন তুই স্ত্রীকে হত্যা করছিলি?

—আমি একশবার করবো। আমার খুশী। তাতে তোর কি?

—আমার আবার কি? তবে আমি তোর হিতৈষী কিনা, তাই।

রাখ। শয়তান আবার হিতৈষী হয়! রাজমোহন বলল,—

জানিস আমি কে? আমার নাম রাজমোহন!

—চিনি বন্ধু, খুব ভাল করে চিনি। কিন্তু আমাদেরও তুমি যে এত শিগ্‌গির ভুলে গেলে! এই দেখ, এবার চিনতে পার কিনা?

লোকটা আঁধার থেকে এবার আলোয় সরে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই চিনতে বাকী রইল না। সে আঁৎকে উঠে বলল—সর্দার তুমি?

—হ্যাঁ। আমি। এই বলে সর্দার এগিয়ে এল রাজমোহনের দিকে। রাজমোহন দেখল সর্দারের হাতে ধারালো ছোরা চক্‌চক্ করছে! রাজমোহনের মুখের ওপর লোলুপ দৃষ্টি রেখে বলল,—বিশ্বাসঘাতক, বেইমান···

—তার মানে? রাজমোহন অবাক দৃষ্টি মেলে বললে—কী বলছো তুমি সর্দার?

—ঠিকই বলছি, তুমি একটা পাকা জুয়াচোর। তোমার শয়তানির আসল রূপ পেয়ে গেছি আমরা। এবার বল, ও গাঁয়ের মাধব ঘোষের কাছ থেকে কত টাকা ঘুষ হিসেবে নিয়েছ তুমি?

—আমি! মাধব ঘোষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি? কি বলছ?

—নাওনি? আকাশ হতে পড়লে দেখছি। সর্দার বলল—তবে আমাদের গোপন খবর সব মাধব ঘোষ কেমন করে জানল? আমাদের দলের কেউ প্রাণ গেলেও কখনও বেইমানি করবে না।

কিন্তু আমি এসব কথা কখন বলবো মাধব ঘোষকে। করুণ সুরে বলল রাজমোহন, আমি তো সর্বদাই তোমাদের সাথে ছিলুম।

—বটে! তোমার বউকে দিয়ে তুমি সংবাদ পাঠিয়েছো মাধব ঘোষের কাছে, তা আমি ঠিক লক্ষ্য করেছি!

—কিন্তু আমার বউকে আমিই যে পাঠিয়েছি, সেকথা তোমায় কে বললে সর্দার? আমার স্ত্রী যে এই কাজ করতে পারে এই খবর আদৌ আমি ঘুণাক্ষরেও জানি না।

—চুপ কর বেইমান। তোমার চালাকি আর বুঝতে বাকী নেই কারুর। বিশ্বাসঘাতকতার যে কি শাস্তি তা তুমি ঠিক জান না—

তোমার প্রাপ্য সেই শাস্তিটাই তোমায় দিতে এসেছি আমি। পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার জন্য তুমি প্রস্তুত হও রাজমোহন।

রাজমোহন ভাবল, সত্যি কথা বলে এদের হাত থেকে কোনক্রমেই নিস্তার পাওয়া যাবে না। সর্দার কিছুতেই রাজমোহনের কোন কথা বিশ্বাস করবে না। তাই এদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে শারীরিক বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কোন পথ নেই। রাজমোহন তাই সজাগ হয়ে থাকল। সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগল কেবল।

সর্দার একটু এগিয়ে আসে রাজমোহনের কাছে। রাজমোহনের কব্জিটা শক্ত করে ধরে ফেলে সর্দার। তারপর ধারালো ছোরাটা তার বুক লক্ষ্য করে উত্তোলিত করে।

ক্ষিপ্রবেগে রাজমোহন সর্দারের তলপেটে মারে প্রচণ্ড এক লাথি। হঠাৎ আঘাতের ফলে কিছু দূরে ছিটকে পড়লো সর্দার। আর তৎক্ষণাৎ সর্দারের হাতের ছুরিটা কেড়ে নিয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসল রাজমোহন।

কিন্তু সর্দারের অনুচর সেথায় উপস্থিত ছিল। পিছন দিক থেকে রাজমোহনকে আক্রমণ করল। রাজমোহন, সর্দার ও তার অনুচরের হাতে বন্দী হল। একটা দড়ি দিয়ে রাজমোহনকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল ওরা। তারপর সর্দার রাজমোহনের কণ্ঠদেশ চেপে ধরল।

দম বন্ধ হয়ে আসে, প্রাণ বুঝি যায়! সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বের হচ্ছে। রাজমোহন দেখল মৃত্যু তার সুনিশ্চিত! আর কোন ক্রমেই রক্ষা নেই সর্দারের হাত থেকে। প্রাণ-ভিক্ষা চাইল সর্দারের কাছে শেষবারের জন্যে।

কাতর প্রার্থনায় হাতের মুষ্টি একটু শিথিল করল দস্যু সর্দার। সে বলল—তাহলে যা জিজ্ঞেস করি, চটপট উত্তর দাও।

বল। আমি সত্যি কথাই বলবো তোমার কাছে।

সর্দার তখন জিজ্ঞেস করল, আমরা যখন সকালে কথা কইছিলাম, তখন তোমার বউ নিশ্চয়ই জেগে ছিল? তুমি সব দেখেশুনে এসে

বললে কেন, সে ঘুমিয়ে আছে ?

—আমি তখন সে অবস্থায় যা দেখেছিলাম, তোমায় তাই বলেছিলাম। এমন তো হতে পারে সে তখন ঘুমায়নি অথচ ঘুমের ভান করে শুয়েছিল। আর চুপি চুপি সব কথা শুনছিল। সর্দার আমি কি শুধু শুধু নারী হত্যা করতে গিয়েছিলাম। আমাদের সব কথা শুনে ও মাধব ঘোষের বাড়ী গিয়ে সব কথা বলে এসেছে। ও যে আমাদের গোপন খবর মাধব ঘোষকে গিয়ে বলেছে সেই জন্যই তো ওকে খুন করছিলাম। নইলে শুধু শুধু একটা নারী হত্যা করতে যাবো কেন বল ?

সর্দারের মনের সন্দেহ এতক্ষণে দূর হয়ে গেল। সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। তাহলে ঐ ডাইনী মাতঙ্গিনীই এসবের মূল। চেঁচিয়ে বলল, তাহলে ঐ মাগীকেই খুন করবো আমি।

রাজমোহনের নিকট থেকে সরে এসে মাতঙ্গিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য উঠে দাঁড়াল সর্দার। কিন্তু একি কাণ্ড। কোথায় গেল মাতঙ্গিনী। হৈ চৈ গোলমালের ভেতর চুপি চুপি কখন যে সে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে, কেউ সে খবর রাখেনি। রাজমোহন বলল, আমার বউ-এর গায়ে তোমরা হাত দেবে না। আমার দেহের বাঁধন খুলে দাও। ঐ ডাইনিকে আমি খুঁজে বার করে নিজের হাতে খুন করব।

—বেশ। তোমার বউ-এর গায়ে হস্তক্ষেপ করার এতটুকু লালসা আমার নেই। রাজমোহনের দেহের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। তারপর সমস্ত বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মাতঙ্গিনীকে পাওয়া গেল না। বৌকে বাড়ী না পেয়ে রাজমোহন চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল বেশীদূর নিশ্চয়ই সে যেতে পারেনি। মনে হয় সামনেই কনকের বাড়ী রয়েছে—সেখানেই সে আশ্রয় নিয়েছে নিশ্চয়ই। তাই দ্রুতপদে কনকের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

তার বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে প্রথমেই শোবার ঘরে ভাল করে উঁকি মেরে দেখল রাজমোহন।

শোবার ঘরে আলো নেই। শুধু নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে।

ডাকাতের সর্দার এদিকে.পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রাজমোহনের।

—কি ব্যাপার? বৌয়ের কোন হদিশ মিলল?

—না, সর্দার। এরা তো সবাই অন্ধকারে ঘুমাচ্ছে।

—তবে?

—আমার মনে হয়, এখানেই আছে সে। তোমরা একটু এখানে দাঁড়াও। আমি একটু ভাল করে দেখে আসছি।

রাজমোহন কনকের ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত করল। শব্দ শুনে ভিতর থেকে সাড়া দিল কনক—কে?

—আমি রাজমোহন। দরজাটা একটু খোল। দরকার আছে।

এতরাত্রে আবার কিসের দরকার। হাঁক ডাকে কনকের মা-ও জেগে উঠল। দরজা খোলা মাত্রই ঘরে ঢুকে পড়ল রাজমোহন।

কনকের মা জিজ্ঞেস করল—রাজ কী খবর? এত রাত্রে কি দরকার তোমার?

—কারণ আমাদের গ্রামে মাধব ঘোষের বাড়ীতে আজ ডাকাত পড়েছিল। তাই সকলকে সাবধান করে রেখে যাচ্ছি।

—কি বলছ তুমি! কনকের মা ভয়-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিছু নেয়নি তো?

—না, ডাকাত দল তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

প্রদীপের আলোয় সে চারপাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে গোপনে যেন কাকে খুঁজছে। কিন্তু কাউকে কোথাও না দেখে অবশেষে বলল, রাত আর বেশী নেই। এখন আর তেমন কোন ভয় নেই। তবুও সাবধানে থাকা অনেক ভাল। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

এই বলে রাজমোহন চলে গেল। কিন্তু নিরাশ হয়েই তাকে ফিরতে হল। কারণ যার উদ্দেশ্যে গেল তার দেখা মিলল না।

॥ আট ॥

মাতঙ্গিনী ভাল করেই জেনেছিল, কনকের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া কোন মতেই নিরাপদ নয়। প্রথমেই রাজমোহন কনকদের বাড়ীতেই তল্লাসী চালাবে। মাতঙ্গিনী তাই নিকটেই ফুলপুকুরে কয়েকটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাতের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দিল। তারপর ভোর হতেই কনকের বাড়ী এসে উঠলো।

ঘুম থেকে উঠে কনক কলসী আর গামছা নিয়ে ফুলপুকুরে স্নান করতে যাচ্ছিল। ভোরে মাতঙ্গিনীকে এভাবে দেখেই সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ একিরে? এই ভোরে কী মনে করে?

তোর সাথে অনেক দরকারী কথা আছে।

কী কথা? আয় ঘরে আয়।

না। এখানে নয় পুকুর-ঘাটেই চল। সেখানেই সব বলব।

মাতঙ্গিনীর কাছে সব লোমহর্ষক কথা শুনে শিউরে উঠল কনক। বলল, সত্যি ভাই! তুই বলেই এত সব করতে পারলি, অন্য কেউ হলে নির্ঘাৎ একটা অঘটন ঘটে যেতো! তা এখন তুই কী করবি স্থির করছিস মাতু?

—কী আর করবো ভাই! এ পোড়া কপালে যা আছে তা সইতেই হবে আমাকে।

তার মানে আবার তুই ঐ খুনে স্বামীটার কাছে ফিরে যেতে চাস? ওর কাছে যাওয়া মানেই তোর মরণ।

তাছাড়া আর কী গতি আছে বল? মরতে আমাকে হবেই, এছাড়া আমার আর কোন পথ খোলা নেই। নিজের ঘর ছেড়ে অন্যের আশ্রয়ে থাকলে কুলটা কলংকিনী বলতে ছাড়বে না।

তা কেন? তুই বরঞ্চ ইচ্ছে করলেই বোন হেমাঙ্গিনীর কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারিস।

না। তা সম্ভব হবে না। আত্মবেদনায় চোখ ছুটি টলটল করে উঠল মাতঙ্গিনীর। বলল, তুইতো সব জানিস ভাই—

'—আমি তা কিন্তু বলছি না। তুই ওখান থেকে কোন লোক নিয়ে সোজা বাপের বাড়ী চলে যেতে পারিস।

—ওটাও সম্ভব নয়। আকুলভাবে কাঁদে মাতঙ্গিনী, বলল—ও বাড়িতে আমি আর ক্ষণকালের জন্যও যেতে পারবো না কনক!

মাতঙ্গিনীর দুঃখে কনকেরও দুচোখে জল এসে গেল। সে তখন কাঁদছিল। এমনি সময় হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন একজন বলে উঠল—কে গো বাছা তোমরা এমন করে কাঁদছো?

প্রৌঢ়াকে দেখে আনন্দিত হয়ে কনক বলল, আর কি বলব সুখীর মা। এই চিরদুঃখিনীর দুঃখের কথাই বলছিলাম আর কি?

সুখীর মাও কলসী পুকুরপাড়ে রেখে ওদের কাছে এসে বসল। বলল ওর আবার দুঃখ কি, যেমন পরীর মতো রূপ ওর—

—স্বামীর সংগে বনিবনা নেই আর কি। রাজমোহনকে তো তুমি চেনো মা। লোকটার স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভাল নয়। ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

—এর জন্য এত কান্নাকাটির কি হোল? স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-ঝাটি একটু হয়েই থাকে। তার জন্য মন খারাপ করে কি হবে?

—তা নয় সুখীর মা। ব্যাপারটা তুমি যত সহজ মনে করছ তা নয়। আসলে ওর স্বামী অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে।

—মরণ আর কি, ঘরে এমন সুন্দর চাঁদপানা টুকটুকে সোমত্ত বৌ থাকতে হারামজাদার আবার এ নেশা হল কেন?

—তাই আমি বলছিলাম সুখীর মা, তুই না হয় ওর জন্য আমাদের বাড়ীতে থাক্!

—হ্যাঁ! তাতো বলতেই পারিস!

কিন্তু জানতো সুখীর মা, আমাদের কিরূপ অবস্থা? আমরা শুতে দেবার জায়গা দিতে পারি। কিন্তু খেতে দিতে পারবো না।

—তাহলে এক কাজ করলে হয় না। ও তো ওর বোন হেমাঙ্গিনীর ওখানে গিয়েও দিন কতক কাটিয়ে আসতে পারে?

—না গো সুখীর মা, সে পথও এ অভাগী কাঁটা দিয়ে রেখেছে?

—কেন? ওখানে আবার কি হল?

—ওমা, জানো না বুঝি? গেল বার শ্রাদ্ধের সময় রাজমোহনকে তো নিমন্ত্রণ করেননি মাধববাবু, সে থেকে ওদের সাথে যে মতবিরোধ চলছে তার ফলে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।

—ঐ অলক্ষুণে স্বামীর জন্য তুমি তোমার মায়ের পেটের বোনকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছো! হায় আমার কপাল! একেই বলে স্বামী-সোহাগিনী। তা বাপু, একটা কাজ করলে হয় না। আমার সাথে না হয় বড় গিন্নীর বাড়ি চলুক। গিয়ে দেখবে কী ভালো মানুষ উনি।

ঠিক এইরূপ একটা প্রস্তাবের আশায় বসেছিল কনক। প্রৌঢ়ার কাছ থেকে এই প্রস্তাব পেয়েই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাতঙ্গিনীকে বলল আর দেরী নয়, এখনই সুখীর মার সাথে মথুরের বাড়ি চলে যা। ওর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথাও পাবি না তুই।

নিজের পোড়া অদৃষ্টকে বারবার ধিক্কার দিল মাতঙ্গিনী। কিন্তু কনকের প্রস্তাব তার অমান্য করার কোন উপায় ছিল না।

॥ নয় ॥

মথুর ঘোষের দুই স্ত্রী। বড় গিন্নীর নাম তারা আর ছোট গিন্নি চম্পক। বড় তারা তেমন সুশ্রী নয়। কিন্তু মনটি তার খুবই উদার। পরের দুঃখ কষ্ট দেখলে নিজের মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মাতঙ্গিনীর দুঃখেও সে বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তাই মথুরকে সব কথা খুলে বলে তার আশ্রয়ের প্রার্থনা জানিয়েছিল। মথুর তার আবদার ফেলতে পারে নি।

চম্পক দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। বলতে গেলে চাঁপা ফুলের মতই ছিল তার দেহশ্রী। কিন্তু বাইরে সে যতটা রূপসী ছিল, ভিতরের রূপটা তার ততটা সুন্দর ছিল না। নিজের রূপের ছটায় ক্রীতদাস করে রেখেছিল স্বামী মথুরকে। একটা গ্রাম্য মেয়েকে এনে নিজের

ঘরে ঠাঁই দেওয়ায় মথুরকে সে কোন ক্রমেই ক্ষমা করতে পারেনি। তাই মাতঙ্গিনীর সাথে প্রথমেই খুব একচোট ঝগড়া করে নিল। মাতঙ্গিনী নষ্টা মেয়ে. মাতঙ্গিনী ঘর পালানো বৌ। এমতাবস্থায় এ মেয়েকে এ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়াও পাপ।

কিন্তু বড় বৌ-এর সাথে কথায় এঁটে উঠতে পারলো না চম্পক। মাতঙ্গিনীর পক্ষ নিয়ে সে চম্পককে অনেক কথা শুনিয়ে দিল।

রাত্রে চম্পকের ঘরে প্রবেশ করেই মথুর বুঝতে পারল চম্পক অভিমান করে আছে। কারণ পৃথক শয্যায় চম্পক নিজের শয়নের ব্যবস্থা করেছে! মথুর চম্পকের নিকট এসে মাথা থেকে ঘোমটা খুলে ফেলে বলল, কী হয়েছে তোমার? মনে হচ্ছে যেন আজ তুমি আমার উপর রাগ করে বসে আছো?

—যাও আমার সাথে কথা বলবে না! আমি তোমার কে? কেউ না! নইলে গ্রামের ঐ নষ্টা মেয়েটাকে এনে তুমি ঠাঁই দিলে।

—ও হো! এই কথা! মথুর হাসলো। বলল, নষ্টা মেয়ে এসব কথা তোমায় কে বললে?

—বলাবলির আবার কী আছে এতে? এতো স্পষ্টই বোঝা যায়। নিজের বোন হেমাঙ্গিনীর বাড়ী থাকতে সেখানে না গিয়ে ও এখানে এল কেন মরতে! তার বাড়িতে নিশ্চয়ই ওর ঠাঁই হবে না, তাই।

—আহা! এখনও তো কোন খারাপ কথা শুনিনি ওর সম্বন্ধে। যেদিন শুনবো সেদিন না হয় দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবো।

তোমরা যা খুশি তা করগে যাও। কিন্তু ঐ মেয়ে বাড়ী থেকে দূর কর বা না কর সেটা তোমার মর্জি, তার আগে আমায় তুমি বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও আর এক পলকও আমার মন টিকৃছে না এখানে। কড়া সুরে বলল চম্পক।

—এ তুমি কি বলছ চম্পক। তোমার যে আমি খুব ভালবাসি! এ অবস্থায় তুমি বাপের বাড়ি চলে গেলে আমার কী হবে? আমি

যে এক মুহূর্তও তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না।

চম্পক বলল—তবে ঐ মেয়েটাকে আগে তাড়াও বাড়ী থেকে।

মথুর এবার আর কোন কথা বললো না। চম্পক আবার বলল—কথা দাও তুমি কালকেই ওকে বাড়ী ছাড়া করবে!

চিন্তিত হল মথুর! বললো—আমায় একটু চিন্তা করতে দাও।

—তবে তুমি চিন্তাই কর। বলে সে পৃথক শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। পরের দিন বৈঠকখানায় যেতেই মথুর শুনতে পেল রাজমোহন তার অপেক্ষায় বসে আছে! মথুর যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজমোহন বলল—আমার স্ত্রী আপনার আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে। মহাশয়ের যদি অনুমতি পাই তবে তাকে গৃহে নিয়ে যেতে পারি।

—হ্যাঁ। তা যাবেন না কেন? নিশ্চয়ই তাঁকে নিয়ে যাবেন। সুখীর মাকে দিয়ে ওকে আমি এখনই আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাতঙ্গিনী রাজমোহনের কথা যখন শুনলো, তখন সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল তার। কেন সে বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে এসেছে, সে কথা তো এদের মধ্যে আর কেউ জানে না। আসল কারণ গোপন করে রেখেছে মাতঙ্গিনী। কেবলমাত্র পারিবারিক কলহই তার গৃহত্যাগর কারণ, এ কথাই জানে প্রত্যেকে। তাই স্বামীই যখন নিজে তাকে নিতে এসেছে, তখন স্বামীর দিক থেকে বিবাদের কারণ নিশ্চয়ই সব মিটে গেছে। মাতঙ্গিনী এসব ব্যাপারে অহেতুক কোন গোলোযোগের সৃষ্টি করল না, বরঞ্চ সুখীর মার হাত ধরে মথুরের বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে পথে বের হয়ে পড়ল।

॥ দশ ॥

রাধাগঞ্জ গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মধুমতী নদী। তার তীরেই রয়েছে একটা ঘন দুর্ভেদ্য অরণ্য।

এই বনাঞ্চলে মানুষের গমনাগমন মোটেই নেই। কারণ অসংখ্য বিষধর সাপ, হিংস্র বন্যপশু এই বনে বাস করে।

মনুষ্য যাতায়াত না থাকলেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় বনের ভেতর অতি ক্ষীণ একটি পদচিহ্ন চোখে পড়ে। কিন্তু সেই পথ এতই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট যে, অপরিচিত কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই পথে গমনাগমন খুবই দুঃসাধ্য।

অরণ্য মাঝে একটি ছোট্ট কুটির। কুটিরটার চারধার ঝোপ-ঝাড়ে সম্পূর্ণ ঢাকা। দেখলে লতাপাতার ঝোপ ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না।

ঐ কুটিরের অভ্যন্তরে কেবল দু'জন লোক বসে আছে। একজন সর্দার আর একজন তার নিত্য অনুচর ভিখু। স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর চাটাই পাতা। তার ওপরে বসে ওরা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে আলাপ করছিল।

সর্দার বলল—এই কাজটা যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে আমাদের অনেক লাভ হত।

—কত সর্দার ?

—তা প্রায় পাঁচ হাজার টাকাতো বটেই !

—তাই নাকি ! তাহলে আর কি ! অতি আরামেই এতগুলো টাকা উপায় করবো তাতে মন্দ কি ?

—কাজটা যতটা সহজ ভাবছিস, ততটা নয় রে ভিখু।

—কেন ? কঠিন আবার কি হল ? মাধবের উইলটা নিয়ে উকিল সাহেব যখন সদরের দিকে যাত্রা করবে, তখন পথে ঐ ব্যাটাকে ঘায়েল করে উইলটা আত্মসাৎ করতে হবে, এই তো।

—হ্যাঁ। কিন্তু মাধব যে উকিলের সাথে আর দু-চার জন লোক পাঠাবে না সে কথা কে বলবে। কিন্তু মাতঙ্গিনীটাই সব কিছু সর্বনাশ করল। মাধব ঘোষকে সব জানিয়ে দিয়ে।

—তাহলে এখন কি করতে হবে সর্দার ?

—উপায় আমি একটা অবশ্য বার করেছি। কিন্তু সেটা এখন গোপন রাখতে চাই, বলবো। তুই শুধু আমার কথা মতন কেবল কাজ করে যা। দেখ কি হয়।

ভিখু বলল—কেমন মতলব করেছো আমাকে একবার বলনা। আমি দিব্যি কেটে বলছি, অন্য কাউকে বলবো না এই কথা। এমনি সময়ে দূর বনে একটি পাখীর শব্দ শোনা গেল। এই সংকেতের প্রকৃত অর্থ সর্দারের জানা। তাই সর্দার বলল, চুপ। রাজমোহন আসছে। তাকে কোন কথা ফাঁস করা চলবে না। সাবধান।

খানিক বাদেই সেই গোপন আড্ডায় রাজমোহন এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে সর্দার প্রশ্ন করল—তারপর, তোমার খবর কি বল? বউ-এর কোন সন্ধান পেলে?

— পেয়েছি সর্দার। তাকে বাড়িতে রেখে এসেছি। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার সর্দার।

—কেন? স্ত্রীকে পেলে কোথায়?

—ভেবেছিলাম মাধব ঘোষের বাড়িতে ওর দেখা পাবো। কিন্তু তা না পেয়ে তাকে পেলাম কিনা মথুর ঘোষের বাড়িতে।

—হুঁ। সর্দার গম্ভীর হল। তাহলে মনে হয় মাতঙ্গিনী মথুর ঘোষের বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটা প্রকাশ করে এসেছে।

—না সর্দার। আমি অতি গোপনে ব্যাপারটার খোঁজ নিয়েছি, মথুর ঘোষকে এসব কথা সে কিছুই বলে নি।

—তা না হয় না বলুক। আমার বক্তব্য হল, ও পাজি বৌকে আর ঘরে পুষে রাখা চলবে না তোমার। তুমি আজকেই দ্বিধাহীন চিত্তে ওকে খুন করে ফেল।

রাজমোহন নিরাশ হয়ে পড়ল। কাল শুধু উত্তেজনার বশেই মাতঙ্গিনীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল বটে, কিন্তু আজ আর সে রাগ নেই, মন তার তাই বড়ই অসহায় হয়ে পড়েছে। মাতঙ্গিনীর ভালবাসা, লাবণ্যময়ী রূপ, ওর অপরূপ দেহশ্রী রাজমোহনকে চিরদিন মুগ্ধ করে রেখেছে। ক্ষণিকের উত্তেজনায় কাল সে যা করতে যাচ্ছিল এখন আর সে তা পারবে না।

রাজমোহন কোমল কণ্ঠে বলল—তুমি একটি বার ভেবে দেখ

সর্দার। আমার বৌ খুব যে একটা বেশী অন্যায় করেছে তা নয়! আমাদের কোন কথা ও ফাঁস করে দেয়নি এ খবরও আমি নিয়েছি!

—বটে! বউ-এর প্রতি খুব দরদ দেখতে পাচ্ছি। তা যে কথাই বলনা কেন বাপু, তুমি হয় তোমার বউকে হত্যা কর, নয়তো এই আস্তানায় সস্ত্রীক বাস কর। ঐ বৌয়ের জন্য আমাদের একটা অঘটন ঘটবে তা কিছুতেই হবে না।

—সে কি! সর্দার? তোমাদের আড্ডায় গিয়ে বাস করবো আমি। আমি কি তোমাব মতন পেশাদার ডাকাত নাকি? আর তাছাড়া আমার কি কেউ নেই ভেবেছো? বোন রয়েছে, পিসি রয়েছে, তাদের ছেড়ে ··

—চুপ কর রাজমোহন। ওসব অজুহাত আমি শুনতে চাই না। আমাদের দলের নিয়ম তোমায় অবশ্যই মানতে হবে। যদি এর ব্যতিক্রম কর তবে শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। আর সেই শাস্তি মানেই মৃত্যুদণ্ড। রাজমোহন কোন কথা বললে না। সর্দার পুনরায় বলল—যাও কালকের দিনটা পর্যন্ত সময় দিলাম। এর ভেতর ভেবে চিন্তে দেখ কি করবে না করবে, পরে আমায় জানিও।

সর্দারের কাছ থেকে রাজমোহন সোজা বাড়ির পথে রওনা হলো।

বাড়িতে এসে রাজমোহন বোনকে ডেকে বলল, একবার তোর বৌদিকে এদিকে আসতে বলতো কিশোরী।

বৌদির কথা শুনে যেন অবাক হয়ে পড়ল কিশোরী। বলল—কোথায় বৌদি! বৌদি সেই যে চলে গেল কালকে, কই এখনও সে তো আর বাড়ী ফিরে আসেনি।

—আসেনি! আমি নিজের চোখে তাকে দেখলাম মথুর ঘোষের বাড়ী থেকে সুখীর মায়ের সাথে রওনা হতে! অথচ তুই বলছিস সে আসেনি।

রাজমোহন রাগে জ্বলে উঠল। সে তখুনি মাধব ঘোষের বাড়িতে লোক পাঠাল মাতঙ্গিনীর খোঁজে। কিন্তু সেখানেও খবর পাওয়া

গেল না মাতঙ্গিনীর। আবার মথুর ঘোষের নিকটও জেনে আসল রাজমোহন মাতঙ্গিনী সেখানেও নেই।

॥ এগারো ॥

আমাবস্যার ঘন অন্ধকারময় রাত্রি।

মাধব নিজের শয়নকক্ষের আলো জ্বালিয়ে আরাম কেদারায় বসেছিল। আশেপাশে বেশ কিছু বই ছড়ান ছিল। মাধবের হাতেও একটি বই। কিন্তু সেই বইয়ের দিকে তার দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি রয়েছে অসংখ্য তারকা-খচিত আকাশের দিকে।

কত কথাই না ভাবছিল মাধব। তার উকিল মামলার যে খবর পাঠিয়েছে তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। তার শত্রুপক্ষে যে সব লোকের খোঁজ পাওয়া গেছে, তারা করতে না পারে এমন কোন কাজ নেই।

মাধব ভাবছিল মাতঙ্গিনীর কথাও। সে মথুরের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল কেন? তবে নিতান্ত গুরুতর কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে তার মত মেয়ে কিছুতেই এমন কাজ করতে পারত না। কিন্তু কি সেই কারণ। কেন আশ্রয় নিল, তার কারণ অবশ্য কিছুটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না মাধবের। মাধবকে সে ভুলতে চায়, তার সমস্ত স্মৃতি মন থেকে চিরদিনের মত মুছে ফেলতে চায়, মাতঙ্গিনী, তাই সে শত বিপদেও মাধবের আশ্রয়ে আসতে চায়নি। কিন্তু মথুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েও হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হল কেন? সে রহস্য শত চিন্তা করেও ভেদ করতে পারেনি মাধব।

ভালবাসার যে জ্বালা কী, তা যেন আজ তিলে তিলে উপলব্ধি করতে পারল মাধব।

সে মাতঙ্গিনীর স্মৃতির জ্বালায় চঞ্চল হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। বারান্দায় মৃদু পায়চারী করে মনকে শান্ত করতে প্রয়াসী হল মাধব। ওদিকে কি দেখছে সে। দেবদারু গাছটার আড়াল থেকে একটা

ছায়ামতন কী যেন বাইরে বেয়িয়ে আসছে। ক্ষণিকের জন্য আবার হঠাৎ আড়ালে চলে গেল ছায়াটা।

কোন পাখী বা অন্য কিছুর ছায়া নয়ত? মাধবের মনে জাগল সন্দেহ। বৈঠকখানা ঘর থেকে একটা ছোট তরবারি হাতে নিয়ে সে বাইরে ছুটে এল। লক্ষ্য করে দেখল সেই দেবদারু গাছটার মাথাব অংশটুকু। কিন্তু সেই ছায়াটার চিহ্নমাত্র নেই।

ব্যাপারটা আরও ভাল করে খুঁটিয়ে দেখবাব জন্য দেবদারু গাছটার নীচের দিকে এসে দাঁড়াল মাধব। আর সহসা একটা রহস্যময় সমস্ত রাত্রির গাঢ় অন্ধকার কেঁপে উঠল। তারপরেই তার হাতের ওপর কোন কিছুর একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল। সেই আঘাতেই হস্তস্থিত তরবারিটি ছিটকে খসে পড়ল মাটিতে। দেহের সামনে ও মাথায় আরও কয়েকটি আঘাত এসে পড়ল পরপর। তৎক্ষণাৎ মাধবকে শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল ওরা।

হতভাগ্য মাধব যখন কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির হাতে নির্যাতিত ও বন্দী, তখন বড় বাড়িতে মথুর ঘোষ তার বড় গৃহিণী তারার শয়ন কক্ষে এপাশ-ওপাশ করছে, কিন্তু ঘুম আসছে না তার।

শিয়রে বসে হাত পাখা নিয়ে অবিরাম হাওয়া করছিল তারা।

তারার ঘরে যখন আজ রাত্রি যাপন করছে মথুর, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে মথুর আজ মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্লান্ত।

এই রকম অবস্থায় যখনই বিশ্রামের প্রয়োজন হয় মথুরের, তখনই সে নির্দ্বিধায় বড় গিন্নীর শয়নকক্ষে রাত্রি যাপন করতে আসে। তারাও তার স্বভাব-সিদ্ধ সেবাধর্ম দ্বারা মথুরের সকল রকম চিত্তবৈকল্য অভিভূত করে দেয়। কিন্তু আজকের এই রাত্রিটুকুই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তারার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

মথুর কেনই বা আজ এমন চঞ্চল হয়ে পড়েছে, তার কারণ তারার অজ্ঞাত। মামলা-মকদ্দমা বা জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে মন ভারাক্রান্ত থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর মানসিক উদ্বেগ আজ এতখানি তীব্র কেন?

ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল তারা—আজ কী হয়েছে তোমার, বল না আমাকে? তুমি ঘুমুচ্ছো না কেন?

—কেমন করে ঘুমোই বল, ঘুম না এলে আমার?

—কী এত ভাবছ বল না?

মথুর চুপ করে থাকে। কোন কথার উত্তর দেয় না সে। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা যদি কিছু মনে না কর একটা কথা বলবো তোমাকে?

—কী কথা বল?

—নিশ্চয়ই তোমার কোন বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকবে হয়তো। কী হয়েছে সেটা আমায় বল লক্ষ্মীটি!

মথুর আঁৎকে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর করল সে—কই। কিছুই হয়নি তো আমার!

—তুমি আমার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না বলছি। আজ কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তুমি কেমন যেন মনমরা হয়ে চলাফেরা করছ। আগের মত ঠাট্টা পরিহাস করে কথা বলো না কারুর সাথে। চম্পার নিকটও কেমন গম্ভীর হয়ে থাকো। মেয়েটা কাছে এলেও তাকে তুমি তেমন যত্ন করে কাছে টান না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে গোলমেলে মনে হয়। মথুর তবু নিরুত্তর।

তারা এবার মথুরের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। চোখের জলে মথুরের বুক ভাসিয়ে দিয়ে সাশ্রুনেত্রে বলল,—ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার কাছে কিছু গোপন কর না তুমি। জানি তুমি আমায় চম্পার মত ভালবাস না, তোমার সুখের ভাগী হবার সৌভাগ্য আমার নেই, তবুও তোমার দুঃখের কথা আমায় সব খুলে বল। নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও আমি তোমার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবো।

তারার কথায় মথুরের মন নরম হয়ে আসে। সে বলে, কই? তেমনি কিছু তো হয়নি আমার। তবে মামলাটা চলছে কিনা?

—কই নতুন কোন মামলায় জড়িয়ে পড়েছো তাও শুনিনি আমি।

তারা কাঁদতে লাগল। অনুতপ্ত হল মথুর। তারাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ছিঃ কেঁদো না তারা। তুমি চোখের জল ফেললে আমার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না: তুমি আমার প্রিয়তমা। তুমি আমার সুখদুঃখের সাথী। দুঃখের দিনে, একমাত্র ব্যাথার দিন তোমার কাছেই তো ছুটে আসি আমি, সান্ত্বনার জন্য, শান্তি পাবার জন্য। কিন্তু আমার এ দুঃখ দূর করবার নয় তারা। আর এ দুঃখের কাহিনী বলতেও পারবো না কাউকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা পেঁচার ডাক শুনে মথুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। তারা জিজ্ঞেস করল—কি! অমন উতলা হয়ে উঠলে কেন?

কিন্তু এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিতে পারল না মথুর। সে প্রায় ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বাইরে বার হয়ে গেল।

তারার মনে বিস্ময় আর মানে না। তারা ভাবে, একটা সামান্য পেঁচার ডাক শুনে সে এমন করে উদ্‌ভ্রান্তের মত বাইরে চলে গেল কেন? এর আগেও তো এরূপ কত পেঁচা ডেকেছে এমনি করে, তখন তো এমন করে চমকে উঠেনি সে। তারা চিন্তিত হল। পেঁচার ডাকটার ভেতর নিশ্চয়ই এমন কোন নিগূঢ় অর্থ খুঁজে পেয়েছে যার জন্য মথুর অমন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দরকার বোধ করল! তবে ঐ ডাকটা নকল ডাক নয় তো।

নানা সন্দেহের দোলায় দুলছে তারা। স্বামী নীচে নেমে গেল দেখে সে ওপর থেকে লক্ষ্য করবার জন্য ছাদে গিয়ে দাঁড়াল।

উপর থেকে প্রখর দৃষ্টি মেলে দেখতেই অন্ধকারের ভেতর অস্পষ্ট একটা মনুষ্য-মূর্তি অনুমান করতে পেল তারা! তার আর বুঝতে বাকী রইল না ঐ মূর্তিই তাঁর স্বামীর।

ভয়ে সমস্ত হৃদয় কাঁপতে লাগল তারার। সেকি, অমন ভীষণ সর্পসঙ্কুল গহন বনের ভেতর এই রাতে প্রবেশ করল কেন মথুর?

বিস্ময় আর আতঙ্ক শতগুণ বৃদ্ধি পেল তারার। সে কেবল নিস্পন্দ ও নির্বাক হয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল ছাদের উপর।

কিছুক্ষণ নানান দুর্ভাবনায় সময় কাটল তারার। তারপর হঠাৎ এক মুহূর্তে আবিষ্কার করল নিজের স্বামীকে। জঙ্গলের ভেতর থেকে সে পুনরায় বাড়িতে ঢুকল। দেখতে পেল মথুর নিঃশব্দে ছোট্ট লোহার গেট খুলে তাব গুদামঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকছে। গুদাম ঘরে কী এমন কাজ থাকতে পারে এত রাতে মথুরের। এই গুদাম ঘরে বৎসরে একটিবারের জন্যও কারুর ঢোকবার প্রয়োজন থাকে না।

গুদাম ঘর থেকে সে যতক্ষণ বেরিয়ে না আসে ততক্ষণ প্রতীক্ষা করে থাকল তারা। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, মথুর তবুও বেরিয়ে এল না। আব অপেক্ষা না করে তারা নিজের শয়নকক্ষে ফিরে এল। তার কিছু বাদেই ফিরে এল মথুর। মথুরকে দেখে তারা আর কোন কথা উত্থাপন করল না। আজ রাত্রের কোন ঘটনা এমন কি কোন প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করল না মথুরের নিকট।

॥ বারো ॥

খুব ছোট্ট একটা ঘর। তাও অত্যন্ত নীচু। একজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে তার মাথা প্রায় ছাদে গিয়ে ঠেকবে। ঘরটার আকার যতটা ক্ষুদ্র, ঠিক তেমনি তার দরজা। একজন মানুষ কেবল হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে পারে ভেতরে। সেই ছোট্ট দরজাতেও আবার লোহার কপাট আঁটা।

ঘরটার ভেতরে একটা ক্ষীণ প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় প্রায়ান্ধকার দেওয়ালগুলো ভয়ঙ্কর একটা রূপ নিয়েছিল। দেওয়ালের চারপাশে কঠিন ইস্পাতের আবরণ।

সেই ঘরের মধ্যে একজন মাত্র লোক রয়েছে। সে হতভাগ্য মাধব

ঘোষ! দস্যুরা তাকে এখানেই বন্দী করে রেখেছে। মাধব অস্থির ও চঞ্চল হয়ে পায়চারী করছিল।

ঠিক এমনই সময় বাইরের দরজায় চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলবার শব্দ হল। পরমুহূর্তেই ঘরের ভেতরে এসে প্রবেশ করল দুইজন লোক। তাদের একজন হল সর্দার। অপরজন তার নিত্য অনুচর ভিখু।

সর্দার আর ভিখু সেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে সতর্কতার সঙ্গে আবার দরজা বন্ধ করে দিল। মাধব ওদের চোখে দেখেও দেখল না! সে একমনে শুধু পায়চারী করতে লাগল।

সর্দার গিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল। তারপর বলল—ভিখু, কলকেটা সাজাতো দেখি। বেশ আরাম করে একটা টেনে নিই।

খানিকক্ষণ গঞ্জিকা সেবনের পর মাধব ঘোষের দিকে চেয়ে বলল সর্দার—কী বাবু চলবে নাকি দুই একটা টান?

মাধব উত্তরে কোন কথাই বলল না। পায়চারী করতে করতে হঠাৎ সে সর্দারের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। বলল, আমাকে কেন তোমরা এত নিষ্ঠুরভাবে আটকে রেখেছো? কী চাও তোমরা? কী চাও বলত?

হাসল সর্দার। বলল,—টাকা চাই, টাকা। অনেক টাকা। তোমাকে আটকে রাখলে সেই টাকা পাবো।

—কিন্তু কে দেবে তোমাদের সে টাকা?

—কে দেবে তুমিই বলতো? কার কথায় আমরা তোমাকে এমন করে আটকে রেখেছি?

—সে কথা জানিনে নাকি ভাবছো? মাধব উত্তর করল—সে লোকটি হচ্ছে মথুর ঘোষ।

—এই ঘরটা দেখে বুঝি ঠিক চিনতে পেরেছ? শুধু মথুর ঘোষের ছাড়া আর কি এমন লোহার ঘর থাকতে নেই এ তল্লাটে?

সর্দার গম্ভীর হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—সে যাক্! কেন তোমাকে আটকে রাখা হয়েছে আর আমাদের টাকাই বা দেবে

কে—সব কথা এখানে অবান্তর। তার চেয়ে বরঞ্চ কাজের কথায় আসা যাক। তোমার উইলটা আমাকে না দেওয়া পর্যন্ত—

এমন সময় ঘরটার মধ্যে হঠাৎ একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ শোনা গেল।

ভিখু শব্দ শুনে চমকে উঠল,—কিসের শব্দ ওটা।

সর্দার সচকিত হয়ে উঠল—কিসের এ শব্দ? তিনজন ছাড়া আর ত কোন চতুর্থ ব্যক্তি নেই এ ঘরে। অথচ কিসের শব্দ হল ওটা? মনে হল যেন. কারুর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

চারিদিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখল সর্দার। কিন্তু অন্য কিছুই নজরে পড়ল না তাদের। নিজের জায়গায় এসে বসে গাঁজার কলকেটা পুনরায় হাতে তুলে নিল সর্দার। ফিস্‌ফিস্ করে বলল,—বেশ তাজ্জব ব্যাপার তো! এই শব্দটা শুনলুম একেবারে স্পষ্ট, অথচ কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

ভিখু গাঁজার কলকে সাজতে সাজতে বলল, হয়তো ভুল শুনেছ সর্দার। আমাদের মধ্যে কারো নিঃশ্বাসের শব্দ মনে হয়।

কিন্তু ভিখুর শেষবারের মত আর কলকে সাজা হল না। আবার অন্ধকারের ভেতর থেকে অমনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

এবার ভিখু সত্যিই ভয় পেল। সর্দারেরও মুখ শুকিয়ে উঠল। সর্দার সাহসী, কিন্তু তবুও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে একটি বিশেষ ভয় পেয়ে বসল সর্দারকে। সে বলল,—দাঁড়া, আমি বাইরে গিয়ে একবার দেখে আসছি।

প্রদীপটা হাতে নিয়ে দাঁড়াতেই ভিখু বলল,—বাঃ। তুমি তো বেশ লোক সর্দার। আলোটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছ, এদিকে এই সুযোগে অন্ধকারের ভেতর যদি বাবুটি পালিয়ে যায়, তখন?

—ঠিক বলেছিস্! নিজের ভুলটা সংশোধন করে নিল সর্দার, একটামাত্র আলো নিয়ে ভেতরের আর বাইরের কাজ চলে কি করে?

প্রদীপে একাধিক সলতে ছিল না। পরনের কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে নিল সর্দার। তাই দিয়ে সে একটা সলতে তৈরী করে প্রদীপের

তেলে ডুবিয়ে আগুন ধরিয়ে ঘরের ভেতর রাখল। আর প্রদীপটা নিয়ে বাইরে এল।

ঘরের বাইরে গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখল সর্দার। কোথাও কিছু নেই, অবশেষে নিরাশ হয়ে আবার ফিরে এল ঘরের ভেতর। ভিখুর দিকে তাকিয়ে বলল সে, জায়গাটা ভাল বলে মনে হচ্ছে না ভিখু। হয়তো অন্ধকারে কোথাও কোন অপদেবতা লুকিয়ে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাওয়াই ভালো।

—তাই কর সর্দার। যা করতে হবে তা চটপট সেরে নাও।

তখন সর্দার মাধব ঘোষের দিকে ফিরে তাকাল।

—শোনো বাবুমশাই। আমাদের কথা যদি তুমি মান তাহলে এখনি এখান থেকে মুক্তি পাবে।

মাধব জিজ্ঞাসা করল—কী কথা?

—তোমার খুড়োর উইলটা যদি আমাদেব হাতে এনে দিতে পারো তবে এখনই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারি।

—তা কেমন করে সম্ভব হবে! উইলটি কি আমি এখানে সাথে করে এনেছি? উইলতো রয়েছে বাড়ীতে। আমি এখানে বন্দী অবস্থায় পড়ে থাকলে কেমন করে তা দেবার ব্যবস্থা করবো?

—উপায়টা আমি তোমায় বাতলে দিতে পারি।

—বলো কী সে উপায়?

সর্দার কাগজ, কলম আর কালি বার করে মাধবের সামনে তুলে ধরল, বলল,—তুমি এই কাগজের ওপর লিখে দাও যে, পত্রবাহকের হাতে যেন তোমার খুড়োর উইলটা দিয়ে দেওয়া হয়।

—তা যেন হল। মাধব বলল,—কিন্তু যার হাতে পড়বে এই চিঠি সে যদি আবার জিজ্ঞেস করে আমার কথা তখন সে কী বলবে?

—তা যা বলবার বলা যাবে, তুমি লিখে দাও।

মাধব দেখল, না লিখে দিয়ে আর তার উপায় নেই। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আবার পূর্বের ন্যায় শব্দ শোনা গেল। এবারে একটা

গোঁঙানির আওয়াজ, কেউ যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় গোঁঙাচ্ছে।

ভিখু আর সর্দার এবার সত্যি ভীষণ ভয় পেল। সর্দার চিৎকার করে উঠল—কে? কে?

এইসব অপদেবতার ভয় মাধব করে না। কিন্তু সেই গোঁঙানির শব্দটা কি! মাধব বলল,—মনে হচ্ছে যেন. ছাদের উপর থেকে এই শব্দটা আসছে। এর ওপরে আর কোন ঘর আছে না কি?

সর্দার বলল, না।

—তবে ছাদের ওপরে কিছু নেই তো আবার?

—তা অবশ্য হতেও পারে। দাঁড়াও আমি একবার দেখে আসছি বলেই সর্দার সেই ঘরটার ছাদের ওপরে উঠে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল সে। বলল—না, ছাদের ওপর কিছুই দেখতে পেলাম না!

মাধব বলল--আশপাশে কোন ঘর আছে কি?

—হ্যাঁ, পাশেই দুটো ঘর আছে আরও।

—সেই ঘরে কি তোমরা কাউকে বন্দী করে রেখেছ?

—না।

—মনে হয় ঐ ঘরেই কেউ। শব্দটা ঐ দিকেই?

—ঐ ঘর দুটোও দেখে আসছি তাহলে।

ভিখু বলল--তালা বন্ধ রয়েছে, কেমন করে দেখবে সর্দার?

—তাতে তেমন কিছু অসুবিধা হবে না। ঘরের মধ্যে যদি কেউ বন্দী থেকে থাকে তো বাইরে থেকে ডাকলেই সাড়া দেবে।

সর্দার বেরিয়ে গেল। ঘর দুটো সে দেখতে পেল ঠিকই। কিন্তু দুটো ঘরই খোলা। কোনরূপ তালা দেওয়া নেই।

সর্দার আবার মাধবের নিকট ফিরে এল। সে এবার অত্যন্ত অসহিষ্ণু। মাধবকে বলল—আর কালবিলম্ব করো না বাপু। যা হয় লিখে দেবার চট্‌পট্ লিখে দাও এবার।

সর্দারের মনোগত ভাব দেখে মনে হল মাধবের, আর একটু বিলম্ব করলেই হয়তো তাকে আটক করে রেখেই চলে যাবে। তবুও

উইলটা রক্ষা করবার জন্ত চেষ্টার ত্রুটি করল না।

মাধব বলল,—আচ্ছা উইলটা আমার কাছ থেকে নিয়ে কি পরিমাণ টাকা পাবে তুমি সর্দার? তুমি আমায় মুক্তি দাও, তোমাকে আমি তার চাইতেও বেশি টাকা দেবো।

সর্দার বলল,—বেশি টাকার আমাদের দরকার নেই। যা পাচ্ছি তাই যথেষ্ট। তুমি মুক্তি পেলে যে আমাদের টাকা দেবে, সেকথা অন্তত আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না।

অবশেষে নিরুপায় হয়েই কলমটা হাতে নিল মাধব। তারপর সে কাছারির আমলার কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল।

আর ঠিক সেই সময়ে ঝন্‌ঝন্‌ করে একটা প্রচণ্ড শব্দ হল।

দাপাদাপি, ছুড়োছুড়ি শুরু হয়ে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তে মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ও গোঁঙানির একটা বিকট আওয়াজ একটা চীৎকার করে ঘর থেকে ছিট্‌কে বাইরে পড়ল ভিখু ও সর্দার দরজায় তালা লাগাবার অবকাশ তারা পেল না ভয়ে আতঙ্কে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

মাধবও যে ভয় না পেয়েছিল তা নয়। তবুও সাহসে ভর করে বাইরে এসে সে কাউকে দেখতে পেল না। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা আলোর শিখা। দীপ শিখাটি লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। দেখল, লণ্ঠন হস্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সৌম্য নারীমূর্তি।

—কে? মাধব গভীর দৃষ্টি নিয়ে সেই মূর্তি লক্ষ্য করল। তারপর হতচকিত হয়ে সে বলে উঠল—একি—তারা তুমি।

—মাধব!

এ অবস্থায় মাধবকে দেখে তারাও কম আশ্চর্য হয় নি। তবুও উভয়ের এই প্রথম বিস্ময়ের মোহ কাটতে বিলম্ব হল না কারুরও। কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা হয় নি তখনও। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসে আবার ভেসে আসছে সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের আর্তকণ্ঠ।

॥ তেরো ॥

তারা আর মাধব অনেকক্ষণ একে অন্যের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

মাধবের সাথে তারার পরিচয় আশৈশব। তারার পিতার গ্রামে ছিল মাধবের মামার বাড়ি। মাধব যখন প্রায়ই মাতুলালয়ে আসতো তখন হতেই দুজনের প্রীতির একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই মধুর সম্পর্ক বহুদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু মথুরের পিতা রাধাগঞ্জ ত্যাগ ক'রে যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল, তখন হতেই তারার সাথে মাধবের অবশ্য দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হয়নি। কিন্তু খুড়োর সম্পত্তি হাতে পাবার পর যখন আবার এই রাধাগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল মাধব, তখন থেকেই আবার পূর্বপরিচয়ের সূত্রটা ক্রমশঃ গভীর হয়ে উঠতে থাকে।

আজ হয়তো মথুর খুড়িমার সম্পত্তি লোভের মোহে মাধবের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা শুরু করেছে! একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোনকালেই মাধবের সাথে মথুরের এই সম্পর্ক ছিল না। বরঞ্চ এর বিপরীত সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল। তখন মাধব প্রায়ই আসত মথুরের বাড়ী। তারার সাথে মেলামেশা করতো মাধব। কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার ভেতর দুইজনে ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্কের এক অমলিন আনন্দ উপভোগ করতো।

এই অবাঞ্ছিত সাক্ষাতে মাধবই প্রথমে জিজ্ঞেস করে—তারা, তুমি এখানে কেমন করে এলে?

—এই একই ধরনের প্রশ্ন আমিও তোমায় করতে পারি।

—আমার সব কথাই তোমাকে সময় মত খুলে বলবো বৌদি।

আমি পুরুষ, আমার পক্ষে এই সময়ে এখানে থাকা অশোভন নয়। কিন্তু তোমার ব্যাপারটাই বড় বেশি রহস্যের বলে মনে হচ্ছে বৌদি।

তারা তখন স্বামীর কোন কথা গোপন না করে আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত বলে যেতে লাগল। মথুরের অস্থিরতা, পেঁচার ডাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতন বাইরে বেরিয়ে যাবার কথা সব কিছু বলল তারা।

এই রহস্যের রূপ উদ্‌ঘাটন হেতু মথুর ঘুমিয়ে পড়লে, তার বালিশের নীচ থেকে গুদামমহলের চাবি নিয়ে নীরবে এখানে চলে আসে তারা। পাশের গুদাম ঘরের দরজা খুলে সে তার ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

—ও তাই বটে। শিকলের যে ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছিল, সেটা তোমারই দরজা খোলবার শব্দ।

—তা একটু হতে পারে। শিকল খোলার সময় শব্দ হয়েছিল বটে।

—আচ্ছা, ঐ দীর্ঘনিঃশ্বাসের যে শব্দটা, মানে এই অন্ধকারেব ভেতর একটা অদ্ভুত আর্তস্বর শোননি তুমি ?

হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু সেটা কি তাহলে তোমাব ঘর থেকেই আসছিল ?

—না, আমার ঘব থেকে ঐ শব্দ আসতে যাবে কেন ?

—তাহলে ঐ শব্দ কিসের ? আতঙ্কিত তারা জিজ্ঞেস করল মাধবকে। কিন্তু মাধব এর কোন সদ্‌উত্তর দিতে পাবল না। দেবাব সময়ও পেল না সে, আবার অমনি একটা আর্তস্বর ভেসে এল। তারা সভয়ে চমকে উঠে বলল—ঐ যে। আবার হচ্ছে…

—হ্যাঁ ঐ শব্দটাব কথাই আমি বলছি। এসো, ঐ শব্দটা কোথা থেকে আসছে, দেখি। তাবা বলল—না, আগে তোমার সব ঘটনার কথা বলে নাও। তুমি কেন এখানে এসেছো।

মাধব স্থির দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকাল। তারপর বলল—আমি সবই বলবো তারা। কিন্তু একটা কথা, আমি যা বলবো, তা তোমাব কাছে হয়তো খুবই অপ্রিয় হবে, বল শুনবে ?

তারার মুখ পাংশু হয়ে গেল ! না জানি কোন কথা শুনতে হয় তাকে তবুও সে জোর দিয়ে বলল—শুনবো।

মাধব তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করল তারার কাছে। ডাকাতি করার কথা, উইল জাল করার চেষ্টা, তাকে অন্ধকারের ভেতর আহত করে এই স্থানে বন্দী করে রাখার যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করল মাধব। তারপর সে বলল, আর এর পেছনে যে অদৃশ্য শত্রু কাজ করছে সে হল তোমারই স্বামী মথুরমোহন।

সমস্ত শুনে তারার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। কিন্তু তবুও সে কোনরূপ বিচলিত হল না, নীরবে সমস্ত দুঃখ-বেদনা সহ্য করল সে। তারপর বলল,—তা যেন হল। কিন্তু তোমার কথায় বুঝলাম, ওরা তোমায় আজকে এখানে নিয়ে এসে বন্দী করেছে। তুমি যে রহস্যের উদ্‌ঘাটন করলে সে রহস্যের শুরু তাহলে কি আজকেই? কিন্তু আমি যে রহস্যের সন্ধানে এসেছি, সে রহস্যের প্রথম শুরু আজ থেকে মাত্র তিনদিন আগে।

—আমার মনে হয়, থেকে থেকে ঐ যে একটা গোঁঙানির শব্দ কানে বাজছে. ঐ শব্দটা কিসের, কোথা থেকে আসছে, জানতে পারলে তুমি রহস্যের অনেকটা সুরাহা করতে পারবে।

—কোথা থেকে ঐ শব্দটা আসছে, সে বিষয়ে তুমি কি কিছু অনুমান করতে পেরেছো?

—না, দস্যুদলের সর্দার অনেক চেষ্টা করেছে, পারেনি।

—কিন্তু একটা জায়গা আছে, সেটা বোধহয় তোমাদের সকলেরই নজর এড়িয়ে গেছে।

—কোথায়?

—এসো আমার সাথে।

—তারার পিছন পিছন মাধব আবার সে গুদাম ঘরে এসে ঢুকল। সেই ঘরের একটা দেওয়ালে অতি ছোট্ট একটি দরজা। ভেতরে প্রবেশ করলে সকলেরই নজর এড়িয়ে যায়। সেই দরজার নিকট প্রবেশ করতেই সেই আর্তনাদ কানে এল।

আর মুহূর্ত মাত্র দেরী অসহ্য হল মাধবের। তারার হাত থেকে

চাবির গোছাটা ছিনিয়ে নিযে এসে পাগলেব মত তালা খোলবার চেষ্টা করল। এক একটা চাবি তালার ভেতরে ঢুকিয়ে বারবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল মাধব। অবশেষে একটি চাবি তালার রন্ধ্রে প্রবেশ করতেই তালাটা সে মুহূর্তে খুলে গেল। সাথে সাথে ভেতরে প্রবেশ করল সকলে।

ঘরের ভেতব প্রবেশ কবেই দেখতে পেল ওবা, একটা অপবিসর সিঁড়ি ধাপে ধাপে উপব দিকে উঠে গেছে ক্রমশঃ। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লো ওবা। ঠিক দোতলা আব এক তলাব মাঝখানে অতি ক্ষুদ্র আব অপবিসর একটি দবজা দেখতে পেল মাধব। চাবি দিয়ে আবার সেই দরজার তালা খুলে ফেলে ঘরের ভেতর প্রবেশ কবল মাধব আব তারা। লণ্ঠনেব আলোয় যে দৃশ্য তারা দেখতে পেল উভযেরই তাতে সর্বশবীর বিস্মযের শিহরণে বোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

ওরা দেখতে পেল মেহগিনি কাঠেব একটা খাটের ওপর শায়িত অতি জীর্ণ শীর্ণ এক নাবীমূর্তি। অনাহারে, লাঞ্ছনায ও যন্ত্রণায় চেহাবা, মুখ তার পাংশু হযে উঠেছে। তবু একটা অপূর্ব জ্যোতি তার সর্বাঙ্গ থেকে যেন বিচ্ছুবিত হচ্ছে চারদিকে। সে জ্যোতি হল ঐ স্নেহময়ী নারীমূর্তিব অফুবন্ত রূপরাশির দীপ্তি।

মাধব আর তারা দ্রুত এগিয়ে যায় ঐদিকে। চোখের এক পলক দেখে চিনিতে পারল যে সে আব কেউ নয়—সে মাতঙ্গিনী।

॥ চৌদ্দ ॥

উভয়েই ধরাধরি কবে মাতঙ্গিনীকে বাইবে আনল।

মাতঙ্গিনী সেই পরিত্যক্ত চোরাকুঠরীর বন্ধ হওয়ায় মৃতপ্রায় হযে পড়েছিল। তারা আর মাধবের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আর বাইরের উন্মুক্ত খোলা বাতাসে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল

সে। বাড়ির অন্দরমহল থেকে তারা একটু খাবারও সংগ্রহ করে আনল। সেটুকু খেয়ে অনেকটা বল লাভ করল মাতঙ্গিনী।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হবার পর সে বলতে শুরু করল তার এই গুদামঘরে নির্মমভাবে বন্দী হবার ইতিহাস। মথুরের জঘন্য পাপকলুস লালসা ও কামনার এক অবর্ণনীয় দুঃখের কাহিনী।

সেই বাড়ী থেকে পালিয়ে মথুর ঘোষের গৃহে আশ্রয় নেবার পর স্বয়ং রাজমোহন এসে মাতঙ্গিনীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানাল। রাজমোহনের কাছে মাতঙ্গিনীকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার করে অন্দর মহলে চলে এল মথুর। সুখীর মার সাথে গোপনে কি যেন পরামর্শ করে আবার নিজের কাজে বাইরে চলে এল মথুর।

সুখীর মা বড় বাবুর নির্দেশ মতই মাতঙ্গিনীকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। পথে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল—এর পর তুমি আবার ঘরে ফিরছো বাছা? ঘরে ফিরতে ভাল লাগছে?

—একটুও মন চাইছে না সুখীর মা।

—তবে যাচ্ছো যে?

—না গিয়ে আর কি উপায় আছে বল। কোথাও যে গিয়ে আশ্রয় নেব সে জায়গা আমার নেই সুখীর মা।

সুখীর মা বলল,—কেন, নিজের ছোট বোন থাকতে, তোমার আবার আশ্রয়ের অভাব।

—বোনের বাড়ী যেতে আমার বারণ আছে। সে কথা তো আগেই বলেছি সুখীর মা।

—তবে তুমি এখান থেকে বাপের বাড়ী চলে যাও।

—বাপের বাড়ী। যেন—আকাশ থেকে পড়ল মাতঙ্গিনী। বলল—সে তো অনেক দূরের পথ। যেতে যে অনেক পয়সা লাগবে। পয়সা আমার কাছে তো নেই সুখীর মা।

শুধু পয়সা নেই বলেই যেতে পারছো না। ও মা, এ আবার

কেমনতর কথা। আচ্ছা, আমি যদি বড় গিন্নীকে বলে পয়সা চেয়ে এনে তোমায় বাপের বাড়ী পৌঁছিয়ে দিই তাহলে তুমি যাবে?

মাতঙ্গিনী আগ্রহের সাথে বলল—হ্যাঁ।

—তবে যাবো বড় গিন্নীর কাছে?

—তাই বরঞ্চ যাও।

—কিন্তু তোমাকে আমি এ অবস্থায় রেখে যাব না। আগলে রেখে যাব। আমাব ফিবতে হয়ত আধঘণ্টা দেরীও হতে পারে। তোমার যা মনমাতানো রূপ, কেউ দেখে ফেললেই গোলমাল হয়ে যাবে।

—না, না। তুমি কিছু ভেবো না, আমায় কেউ দেখতে পাবে না। এই তো, আমি এই গাছটার আডালে লুকিয়ে রইলাম—

—পাগল! গাছের আড়ালে এভাবে নিজেকে লুকোলেই বুঝি তুমি সব কিছুর আডালে চলে যাবে ভাবছ। না—বরঞ্চ তুমি এস আমার পিছন পিছন। তোমাকে আমি ভাল জায়গায় লুকিয়ে রেখে যাই।

গুদাম মহলে এসে মাতঙ্গিনীকে একটা চোরা কুঠরীতে ঢুকাল সুখীর মা। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করামাত্র একটা শীতল রক্তস্রোত যেন বুকের ভেতর দিয়ে হুহু করে বয়ে গেল মাতঙ্গিনীর। পিছন ফিবে সুখীর মার দিকে চাইতেই আতঙ্কে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল মাতঙ্গিনী। দেখল সুখীর মা তাকে ফেলে ঘব থেকে বাইরে বের হযে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট কুঠুরীটার দরজাও বন্ধ হয়ে গেল।

মাতঙ্গিনীকে এভাবে বন্দী করার পিছনে মথুরের একটা লোলুপ উদ্দেশ্য ছিল। সেই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ কববার প্রয়োজনেই সন্ধ্যার সময় মাতঙ্গিনীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এল মথুর। একটা হিংস্র সর্পিনীর মত ফণা তুলে যেন মথুরের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল সে। রুদ্ধ অপমানে আর আক্রোশে যেন আরও শক্তিশালী হয়েছিল মথুরের পাশবিক ইচ্ছা। সে বলেছিল—বেশ, তুমি তোমার সতীত্বের বড়াই নিয়ে কতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পার আমি দেখব। আজ

থেকে তোমার আহারও বন্ধ।

সেদিন থেকে মাতঙ্গিনীর উপবাস শুরু হয়ে গেল। সে মথুরের উপপত্নী হবার প্রস্তাবে কোন মতেই রাজি হয়নি, মথুরও নিজের কথার এতটুকু নড়চড় করেনি।

সেই রাত্রেই মাধব ঘোষ নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু মাতঙ্গিনী যায়নি। ঠিক হয়েছিল এই দুর্বল শরীর নিয়ে এতরাত্রে দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। আজকের রাতটুকু কোনমতে তারার গৃহেই কাটিয়ে দেবে সে। তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে করুণার সাথে মাধবের বাড়িতে চলে আসবে।

পরদিন মাধবের গৃহে দুই বোন আবার একসাথে মিলল। মাতঙ্গিনাকে বুকে জড়িয়ে ধরল হেমাঙ্গিনা। তারপর দুজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বলল—তোমাকে আর এ-অবস্থায় কখনো ছাড়বো না দিদি। তুমি আর কোথাও যেতে পারবে না। তুমি চিরকাল আমাদের এখানে থাকবে।

স্থির দৃষ্টিতে মাতঙ্গিনী হেমাঙ্গিনীর মুখের পানে তাকাল। তারপর বলল—না বোন। দুঃখ যে আমার চিরদিনের সাথী। আমাকে চলে যেতে হবে!

—কোথায় যাবে দিদি?

—বাবার কাছে।

॥ পনেরো ॥

সেদিন ঘনকৃষ্ণ মেঘে দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত।

মথুর তার ঘরে বসে আকাশ-কুসুম ভাবছে। আর কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল তার বুক।

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ দূরে শঙ্খধ্বনির মতো একটা শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে পারল মথুর—এ হল সর্দারের সঙ্কেতধ্বনি। সর্দার তাকে ডাকছে। একবার ভাবল, না, আর যাবে না ওদের কাছে। কিন্তু সেই শঙ্খধ্বনি অবিরাম হতে থাকায় আর নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারল না মথুর। সে সেই ঝড় উপেক্ষা করেই বাইরে বেরিয়ে এসে একটা বটগাছের তলায় দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পরই সেখানে এসে দাঁড়াল দস্যু সর্দার। তাকে দেখেই মথুর বলল—আর কেন ভাই। অনেক তো করেছি, এইবার আমায় মুক্তি দাও। তোমাদের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।

—বিশ্বাসঘাতকতা! এসব কি কথা বলছো কর্তাবাবু? বিশ্বাস-ঘাতকতা কে করল? তুমি বিশ্বাস কর আমরা ইচ্ছে করে এসব কাজ করিনি। অসাবধানতার জন্যই ঘটে গেছে ব্যাপারটা।

—যাক, বেশ হয়েছে। আবার আমায় জ্বালাতন করতে এলে কেন?

—সে তোমারি ভালর জন্যে কর্তা। নিমক তোমার অনেক খেয়েছি। তাই তোমার এমন বিপদে একটু সাবধান করতে এলাম।

মথুর বলল—নূতন করে আবার কি বিপদ সর্দার?

—আমার একনিষ্ঠ অনুচর ভিখুকে তো স্মরণ আছে কর্তাবাবু?

—হ্যাঁ খুব মনে আছে। কিন্তু কেন, কী হয়েছে তার সর্দার?

—পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে!

—তাই না কি? সর্বনাশ! তারপর?

—তারপর আরও খবর। সে খবর আরও মর্মান্তিক। পুলিশের বড় কর্তার কাছে তোমার-আমার সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে ভিখু।

কথাটা শোনামাত্র মথুরের মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল। সে রীতিমত ভয়ে জিজ্ঞেস করল—আমি এখন কী করবো সর্দার।

—কী আবার করবে! প্রাণ নিয়ে এবার পালাও। আমার

তো আর একটুও এই গ্রামে বাস করতে মন চাইছে না। তোমাকে আমি তাই পূর্বেই সাবধান করে দিলাম বাবু।

কথাটা বলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গহন অরণ্যের পথে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল দস্যু সর্দার।

মথুর গৃহে ফিরে এসে বসে বসে ভাবতে লাগল। কিন্তু ভেবে ভেবে সে এর কোন কিছুই কুলকিনারা দেখতে পেল না।

নিরুপায় হয়ে একটা উপায় খুঁজে বার করল সে। ঠিক করল, পুলিশের লোককে টাকা দিয়ে বশ করবে মথুর। নিজের এই সমূহ বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় এ ছাড়া আর ভিন্ন কিছু নেই। কিন্তু অসুবিধাও আছে—সেটা হল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন আইরীশম্যান। তার সকল কাজেই দারুণ উৎসাহ। মথুরের এই ঘটনাটিতে যদি সেই ভদ্রলোক নাক গলান, তাহলে বিপদ কাটিয়ে ওঠা মথুরের পক্ষে এক দারুণ মুস্কিলের ব্যাপার হবে!

ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একটা লোক উদ্‌ভ্রান্তের মত মথুরের ঘরে এসে ঢুকল। সর্বাঙ্গে বৃষ্টির জলে আর কাদায় মাখামাখি। মথুরের কাছে এসেই সে বলল—বাবু শিগ্‌গিরি পালান এখান থেকে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আসছেন এই গ্রামে।

—কী ব্যাপার বলতো?

লোকটি মথুরের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। জেলা আদালতে সে মথুরের পক্ষে কাজ করে থাকে। সে বলল—ভিখু নামে একজন ডাকাত নাকি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সব কিছু স্বীকার করেছে। আজ পর্যন্ত যে সব ডাকাতি আর রাহাজানি করেছে তারা, তার পিছনে নাকি মথুরের পূর্ণ নির্দেশ ছিল। এই খবর পাওয়ামাত্রই আমি দ্রুত আপনার গৃহে এসেছি এই খবর দিতে।

লোকটা এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কথাগুলো বলে আবার জিজ্ঞেস করল—সে কি, আপনি পালাবেন না হুজুর?

—হ্যাঁ পালাবো! তুই যা এখান থেকে।

লোকটা চলে গেল। পরদিন সকালেই স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দলবল নিয়ে মথুরের গৃহে শুভপদার্পণ করলেন। কিন্তু তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য মথুরকে সে সময় কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর সেই গুদামঘরের একটি ক্ষুদ্রকুঠরীতে যেখানে মাতঙ্গিনী ও অন্যান্যরা বন্দী ছিল, সেইখানেই দেখতে পাওয়া গেল মথুরকে। কিন্তু যা পাওয়া গেল তা মথুরের প্রাণহীন দেহটি। ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে মথুর।

সর্দার কোথায় পালিয়েছে, তার হদিশ কেউ পেল না। তবে ভিখুর নির্ভীক জবানবন্দীতে আর একটি ব্যক্তি একান্তভাবে জড়িয়ে পড়ল। সে ব্যক্তি রাজমোহন! রাজমোহন ও ভিখু নিজেদের দোষ অকপটে স্বীকার করায় শাস্তির ভার একটু লঘুই হল। উভয়কেই দ্বীপান্তরে চালান দেওয়া হল।

চির-অভাগী মাতঙ্গিনী তার বাবার কাছেই ফিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। যে ক'টাদিন বেঁচেছিল, একটু শান্তিতেই ছিল। কিন্তু সে শান্তিও বেশীদিনের নয়। অতি অল্প কিছুদিন পরেই ইহলোকের যাবতীয় খেলা ফেলে সে পরলোকের পথে যাত্রা করল।

—শেষ—